হীরের নাকছাবি

সাগরময় ঘোষ

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
প্রাতঃস্মরণীয়েষু

লেখা চাহিয়া লজ্জা দিবেন না

আমার উপর যখন পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তখন মনে মনে আমি দুটি সঙ্কল্প করেছিলাম। প্রথম, নিজে কখনো কোনোদিন লেখক হব না। দ্বিতীয়, যে-পত্রিকায় সম্পাদনার কাজ করব সে-পত্রিকায় স্বনামে কোনোদিন কিছু লিখব না। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, লেখক হবার মতো ক্ষমতা আমার কোনোদিনই ছিল না—আজও নেই। শুনেছি বড় বড় জ্ঞানী-গুণীরা বলে থাকেন লেখক হতে গেলে তিনটি ক্ষমতার অধিকারী হওয়া প্রয়োজন।

প্রথমত প্রচুর পড়াশুনো অর্থাৎ বিদ্যেবুদ্ধি থাকা চাই, দ্বিতীয়ত জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে আর তৃতীয়ত কতখানি সিমেন্টের সঙ্গে কতখানি বালি মেশালে ইমারত গাঁথা যায়, সে ফর্মুলাটুকুও জানতে হবে। অর্থাৎ, কতখানি বাস্তব ঘটনার সঙ্গে কতটুকু কল্পনার মিশেল দিলে সে-লেখা সাহিত্য পদবাচ্য হবে সে-বিষয়ে টনটনে জ্ঞান থাকা চাই। আফসোসের বিষয় আমার জীবনে এই ত্রিশক্তির কোনোটাই বিন্দুমাত্র ছিল না বলেই সাহিত্যিক হবার সুযোগ আমি পাইনি। বিদ্যেবুদ্ধির কথা যদি বলেন, আমি হচ্ছি 'ক' অক্ষর গোমাংস। কোনো রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হতে পেরেছিলাম বি. এ. ডিগ্রীর লেজুড় নিয়ে। পড়াশুনোর দৌড় ঐ পর্যন্তই। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা? শান্তিনিকেতনের সহজ সরল শৈশব ও কৈশোর জীবন পার হয়ে যৌবনে কলকাতায় এসে সেই যে সাংবাদিকতার চাকরির জোয়াল কাঁধে নিয়েছি আজও তা সিন্ধবাদ বুড়োর মতো জম্পেশ হয়ে কাঁধেই চেপে বসে

আছে, নামবার আর নামটি করছে না। রঁাধার পরে শোওয়া আর শোয়ার পরে রঁাধার মতো আমার জীবনটাও এক নিয়মে এক চাকাতেই বাঁধা। সুতরাং এ-জীবনের বৈচিত্র্যই বা কোথায়? আর অভিজ্ঞতার পরিধি যদি বলেন আমি আসলে একটি গোষ্পদ, নাম সাগর হলে কী হবে। এবার তৃতীয় ক্ষমতার কথা বলি, কল্পনার কথা। কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পা দিয়েই অন্য সকলের মতো নিয়মমাফিক আমিও একটি মেয়েকে নিয়ে কিছু কল্পনা করেছিলাম, দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে কিছু বিনিদ্র রজনীও কেটেছিল। অসামান্য সে নারী। নামটি তার বলব না, আমি কিন্তু তাকে নিয়েই কিছু কল্পনার জাল বুনেছিলাম কিন্তু সে জাল ছিন্ন হয়ে গেছে বহুকাল আগেই। সে প্রসঙ্গ এখন থাক।

প্রারম্ভে যে-কথা বলে এই স্মৃতিচারণের প্রস্তাবনা করেছিলাম আবার সেই কথাতেই ফিরে আসি। আমার সম্পাদক জীবনের প্রথম সংকল্প থেকে একটি বিশেষ ঘটনা আমাকে বিচ্যুত করেছিল। সে-ঘটনাই বলবার জন্য দীর্ঘ বিরতির পর আজ আবার কলম ধরেছি। কিন্তু আমার দ্বিতীয় সঙ্কল্প থেকে আজও আমি বিচ্যুতি হইনি। যে-পত্রিকার সম্পাদনা-কাজে আমি আজও নিযুক্ত, সে-পত্রিকায় অদ্যাবধি কোনো লেখাই স্বনামে আমি লিখিনি।

যে-কথা বলব বলে কলম ধরেছি এবার তা আপনাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করছি। লেখক হবার দুর্মতি আমার হয়েছিল শ্রদ্ধেয় শিল্পীস্রষ্টা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্ররোচনায়। প্রথমে তাঁর চরণবন্দনা করে আমি সে-প্রসঙ্গের অবতারণা করি।

১৯২৫ সালের কথা। দেশ পত্রিকাকে ঘিরে সে-সময় একটি লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে, তাঁদের কলরবে তখন বাংলা সাহিত্যের

প্রাঙ্গণ মুখরিত। স্বাধীন ভারতে দিকে দিকে তখন নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়েছে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গও পিছিয়ে নেই। দামোদর ভ্যালী করপোরেশন পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার অঞ্চলে বিরাট এলাকায় নদী নিয়ন্ত্রণ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও ক্যানাল কেটে জল-সরবরাহ করে পশ্চিমবঙ্গের অনুর্বরা ভূমিকে উর্বরা করার পরিকল্পনা নিয়ে বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে তখনকার কংগ্রেসী সরকারের সেচমন্ত্রী ছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায়। তিনি স্থির করলেন দামোদর ভ্যালী করপোরেশনের কাজকর্ম যতদূর অগ্রসর হয়েছে তা পশ্চিমবাংলার এম-এল-এ ও সাহিত্যিকদের ঘুরিয়ে নিয়ে দেখানো, যাতে তারা কাজের এই সূত্রপাত দেখে ভবিষ্যৎ বাংলার একটি উজ্জ্বল চিত্র দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে পারেন। তারাশঙ্করবাবু অগ্রজ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক, তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁরই উপর ভার দিলেন সাহিত্যিকরা কে-কে যাবেন তার তালিকা নির্ধারণের। সাহিত্যিকদের দলনেতা হিসেবে তিনিই তালিকা পেশ করলেন, সেই তালিকা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার দপ্তর থেকে আমন্ত্রণলিপি বিতরিত হল। দেখা গেল আমন্ত্রিতদের মধ্যে দেশ পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর সকলেই আছেন, যেমন সুবোধ ঘোষ, বিমল মিত্র, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গৌরকিশোর ঘোষ প্রভৃতি, শুধু আমার নামটাই বাদ। আমার লেখক বন্ধুরা ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখলেন না। সরকার চাইছেন লেখকরা ফিরে এসে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা পত্রিকায় লিখবেন। যে-ব্যক্তি লেখকদের উৎসাহ দিয়ে তাগাদা দিয়ে লেখাবেন এবং সে-লেখা ছাপবেন, তাঁকে দলভুক্ত না করাটা তাঁদের মনঃপূত হল না। তাঁদেরই মধ্যে একজন কেউ কথাটা তুললেন কানাইলাল সরকারের কানে।

আর যায় কোথা। তপ্ত তেলে বেগুন ছাড়া হল। ছ্যাঁৎ

করে উঠলেন কানাইদা। কানাইদা তখন আনন্দবাজার পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগের হর্তাকর্তা, দেশ পত্রিকারও তিনিই ছিলেন কর্ণধার। কংগ্রেসী মহলে এমনকি মন্ত্রিমহলেও কানাইদার ছিল অগাধ প্রতিপত্তি।

উত্তেজিত কানাইদা আমার ঘরে ঢুকেই বললেন—তোমার নাম নাকি দলে নেই? এই অবিচার আমি হতে দেব না। আমি দেখতে চাই তোমার নাম কী করে বাদ যায়।

কানাইদাকে ঠাণ্ডা করবার জন্য আমি বললাম—আমার নাম বাদ গেছে, তাতে কী হয়েছে। তাছাড়া তারাশঙ্করবাবুর উপর যখন তালিকা নির্মাণের ভার দেওয়া হয়েছে তখন আমার নাম বাদ যাবার কারণ আপনি তো ভালো করেই জানেন। সুতরাং এ নিয়ে আপনি আর দরবার করতে যাবেন না, সেটা আমার পক্ষে খুবই অবমাননাকর।

কানাইদা ছাড়বার পাত্র নন। তিনি ধরে নিয়েছেন, আমার নাম বাদ দেবার অর্থ দেশ পত্রিকাকে অবজ্ঞা করা। কিছুতেই তা হতে দেওয়া যেতে পারে না। কানাইদার মাথায় যখন যেটা ঢোকে তার একটা হেস্তনেস্ত না করে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি টেলিফোন করলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রচার বিভাগের গোপাল ভৌমিককে। জানতে চাইলেন, দেশ পত্রিকার সাগরময় ঘোষকে কেন আমন্ত্রিত লেখকদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হল। তাকেও আপনাদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে। আর তা না করলে আমরা ধরে নেব দেশ পত্রিকাকে আপনারা উপেক্ষা করছেন। সেটা করা কি উচিত হবে? উত্তরে গোপালবাবু জানালেন, তালিকা নির্বাচনের ভার যখন তারাশঙ্করবাবুকে দেওয়া হয়েছে তখন বিষয়টা তাঁর গোচরে আমাদের আনা উচিত। তিনি সম্মত হলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমন্ত্রণলিপি পাঠাবো।

কানাইদাকে আমি বারবার এ-কাজ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়েছি। ব্যাপারটা তখন কানাইদার কাছে একটা চ্যালেঞ্জস্বরূপ দেখা দিয়েছে।

এক ঘণ্টা পরে কানাইদা আবার হন্তদন্ত হয়ে আমার ঘরে এসে রাগে ও উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন। বললেন—জানো, তারাশঙ্করবাবু কী বলেছেন ? গোপাল ভৌমিক টেলিফোন করে বিষয়টা ওঁকে বলতেই তার উত্তরে বলেছেন—সাগর কি লেখক ? সে কি এক লাইন কখনো কিছু লিখেছে যে তাকে লেখক-শ্রেণীভুক্ত করে আমন্ত্রণ জানাতে হবে ?

একথা বলেই কানাইদা যেমন দ্রুতপায়ে আমার ঘরে এসেছিলেন তেমনই দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমার কথা শুনবার জন্য অপেক্ষা করলেন না।

আমি স্তম্ভিত। মনে মনে ধিক্কার দিলাম নিজেকে। তারাশঙ্করবাবু তো ঠিক কথাই বলেছেন। আমি আবার লেখক হলাম কবে ? কিন্তু কানাইদা যে-রকম ক্ষেপে গেছেন তাঁকে এখন থামাই কি করে ?

তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে ছুটে গেলাম কানাইদার ঘরে। কানাইদা নেই। শুনলাম, এইমাত্র তিনি গেছেন রাইটার্স বিল্ডিং-এ। মনে মনে প্রমাদ গুনলাম।

বিমর্ষচিত্তে নিজের ঘরে ফিরে এসে চুপচাপ বসে আছি। মনে মনে ভাবতে লাগলাম ১৯৪০ সালে দেশ পত্রিকা সম্পাদনার কাজে আমি নিযুক্ত, এটা ১৯৫৫ সাল। এই পনেরো বছর নিজের পত্রিকাতে তো নয়ই, অন্য কোনো পত্রিকাতেই আমি কখনো কিছু লিখিনি। কিন্তু আমি যখন কলেজের ছাত্র, প্রবাসী পত্রিকা যখন খ্যাতির তুঙ্গে, রবীন্দ্রনাথ যে-কাগজের একজন নিয়মিত সর্বাগ্রগণ্য লেখক, তখন সেই কাগজেই আমার একাধিক লেখা বেরিয়েছে—আমার দুর্ভাগ্য সে-লেখা তারাশঙ্কর-

বাবুর নজরে পড়েনি। বিচিত্রা পত্রিকায় যখন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের লেখা একসঙ্গে বেরোচ্ছে সেই সময়ে আমারও দুটি রচনা বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছিল। হায়, সে-দুটি লেখাও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। অবশ্য না করারই কথা। কাঁচা বয়সের ততোধিক কাঁচা রচনা কারোর নজরে পড়ার মতো নয়, পড়লেও এতকাল পরে তা মনে রাখা একেবারেই অসম্ভব।

ঘণ্টা দুই বাদে আবার কানাইদার আবির্ভাব এবং এবারে চোখে মুখে বিজয়ের হাসি। কানাইদা বললেন—যাক্, আমন্ত্রিতের তালিকায় অজয়দা স্বয়ং তোমার নাম ঢুকিয়ে দিয়েছেন, আর কারো কিছু বলবার নেই। তোমার নামে কালই চিঠি এসে যাচ্ছে।

আমার কাছে ব্যাপারটা খুব সুখকর মনে হল না। একটা হীনমন্যতাবোধ আমাকে স্বস্তি দিচ্ছিল না বলে কানাইদাকে বললাম—আপনিই বলুন, এভাবে নিমন্ত্রণ আদায় করে আমার পক্ষে যাওয়াটা কি উচিত হবে? আর তারাশঙ্করবাবুই বা কি মনে করবেন।

কানাইদা বললেন—তিনি কি মনে করবেন না করবেন সেটা বড় কথা নয়। এটা সরকারী আমন্ত্রণ। সেখানে তোমার নাম বাদ দেওয়া মানে দেশ পত্রিকাকেই উপেক্ষা করা। অজয়দা সেটা বুঝতে পেরেই নিজে তোমাকে আমন্ত্রণ জানাবার নির্দেশ দিয়েছেন। এখন তুমি যদি না যাও, আমারই বা মুখ থাকবে কোথায় আর অজয়দাই বা কি মনে করবেন।

অগত্যা কানাইদার কথা আমাকে মেনে নিতেই হল, আমি যাওয়াই স্থির করলাম। আমার সাহিত্যিক বন্ধুরাও এ-সংবাদ শুনে উল্লসিত। আমি কিন্তু বিন্দুমাত্র উল্লাস বোধ করতে পারলাম না। সর্বদাই মনে হতে লাগল তারাশঙ্করবাবু আমাদের দলপতি হয়ে যাচ্ছেন, তিনি আমাকে কী ভাবে গ্রহণ করবেন

জানি না। একটা অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে মনে করে বেশ খানিকটা মুষড়ে পড়লাম।

যাবার দিন শেষ মুহূর্তে জানা গেল তারাশঙ্করবাবু আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন না, হঠাৎ জরুরী প্রয়োজনে তাঁকে বীরভূমে নিজের গ্রাম লাভপুরে চলে যেতে হয়েছে। নিতান্তই জরুরী প্রয়োজনে— না অলেখককে লেখক দলভুক্ত করার প্রতিবাদে তিনি আমাদের সঙ্গে ডি. ভি. সি. গেলেন না? এ-প্রশ্নের আজও কোনো যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর আমি খুঁজে পাই নি। যদিও তাঁর মুখোমুখি হবার অস্বস্তি থেকে তিনি আমাকে সে-যাত্রা বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর সেই মন্তব্য—'সাগর কি লেখক? এক লাইনও কিছু কি লিখেছে?' ঘুণপোকার মতো সেই বাক্য দু'টি মনের মধ্যে বাসা বেঁধে সর্বক্ষণ কুরে কুরে খাচ্ছিল।

দামোদর ভ্যালী থেকে ফিরে আসার পরে নানা অনুষ্ঠানে তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয়, কিন্তু তাঁর সহৃদয় অমায়িক ব্যবহারে কখনো কোনো দিন বুঝতে দেননি যে, আমার প্রতি তাঁর একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান তিনি তখনো মনের মধ্যে পুষে রেখেছেন। আমি জানতাম, শিল্পীরা স্বভাবতই অভিমানী। বিশেষ করে তারাশঙ্করবাবুর মতো শিল্পী, যখন বাংলা সাহিত্যে সম্রাটের আসনে সসম্মানে সমারূঢ়। আমি যে তাঁর স্নেহসিক্ত অন্তর থেকে দূরে সরে গিয়েছি তিনি তা তাঁর আচার-আচরণে কথাবার্তায় কখনো জানতে দিতে না চাইলেও আমি বুঝতে পেরেছিলাম শারদীয় দেশ পত্রিকায় লেখা চাওয়ার ব্যাপারে। যখনই তাঁর কাছে লেখার প্রার্থনা জানিয়ে চিঠি দিয়েছি তিনি শারীরিক অসুস্থতা অথবা নানাবিধ কাজের কারণ দেখিয়ে এড়িয়ে গেছেন। সে-সময় বেশ কয়েক বছর দেশ পত্রিকা তাঁর লেখা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল এবং আমার কাছে সেটা ছিল চরম দুর্ভাগ্যের কয়েকটি বৎসর।

লেখক না হতে পারার অপরাধে তারাশঙ্করবাবুর বিরাগ-ভাজন হবার জন্য যখন আমার মন হতাশায় মুহ্যমান ঠিক সেই সময়ে আমার জীবনে ক্ষিতীশ সরকারের আবির্ভাব। আবির্ভাব না বলে বলা উচিত উদার অভ্যুদয়। ক্ষিতীশবাবু তখন উল্টোরথ পত্রিকা সম্পাদনা কাজে নিযুক্ত এবং তিনি ছিলেন প্রসাদ সিংহের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। প্রায়ই তিনি দেশ পত্রিকা অফিসে আসতেন, আড্ডা দিতেন, গল্পগুজব করতেন। সেই সঙ্গে গোল্ড ফ্লেক সিগারেট বিতরণে তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। মৃদুভাষী, সদাহাস্যময় এই সহৃদয় মানুষটির মধ্যে একটা দুরন্ত বোহেমিয়ানিজম আমাকে তীব্র আকর্ষণ করত, যার ফলে তাঁর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে আমার কিছুমাত্র বিলম্ব ঘটেনি। আমাদের সান্ধ্যকালীন আড্ডায় তাঁর উপস্থিতি ছিল অনিবার্য এবং অপরিহার্যও।

উল্টোরথ পত্রিকার রাতারাতি সাফল্যের মূলে ক্ষিতীশ সরকারের হাত ছিল অনেকখানি। কিন্তু কি কারণে জানি না উল্টোরথের স্বত্বাধিকারী প্রসাদ সিংহের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটায় হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিলেন। আগেই বলেছি কানাইদা, অর্থাৎ কানাইলাল সরকার তখন ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগের কর্তা। দেশ পত্রিকার ঘরেই ক্ষিতীশবাবুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল এবং কানাইদা তাঁকে অত্যন্ত স্নেহের চোখেই দেখতেন। উল্টোরথের কাজ ছেড়ে দেবার কথাটা তাঁর কানে তুলে দেওয়ামাত্র তিনি তাঁকে আনন্দবাজার পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগের কাজে ডেকে নিলেন। কিন্তু দশটা-পাঁচটার বাঁধা নিয়মের কাজ আর বসে বসে বিজ্ঞাপনের ইঞ্চি আর সেন্টিমিটারের হিসেব কষা ওঁর ধাতে সইবে কেন। পত্রিকা সম্পাদনার নেশা এমনই পাজী নেশা যে, একবার স্বাদ পেলে তার হাত থেকে সহজে মুক্তি নেই।

আনন্দবাজার পত্রিকার চাকরিটা হঠাৎ ছেড়ে দিলেন

ক্ষিতীশবাবু। বেশ কিছুদিন ওঁর কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না। খোঁজখবর নিতে গিয়ে জানা গেল, রানাঘাটে পৈত্রিক ভিটেয় ফিরে গিয়ে কিছু একটা ব্যবসায় মেতে উঠেছেন। আবার শোনা গেল তা নয়, তিনি কলকাতাতেই আছেন এবং একটা প্রেস খুলে জব প্রিন্টিং-এর কাজে লেগেছেন।

একদিন সন্ধ্যায় খালাসিটোলায় 'অন্তর্জলী যাত্রা'-র লেখক কমলকুমার মজুমদারের সঙ্গে আড্ডা জমিয়েছি এমন সময় সেখানে ক্ষিতীশবাবুর আগমন। বহুদিন বাদে ক্ষিতীশবাবুকে পেয়ে আড্ডা হৈহৈ করে জমে উঠলো।

কমলবাবু বললেন—কি গো বাবু, এতদিন আসোনি কেন? কোথায় গা ঢাকা দিয়েছিলে?

মুখে অমায়িক মৃদু হাসি, কোনো উত্তর নেই। পকেট থেকে গোল্ড ফ্লেকের নতুন প্যাকেটটা টেবিলের উপর রেখে বেয়ারা মোহনকে ডেকে তার হাতে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে কী কী আনতে হবে ফরমাশ করে বললেন—এতদিন নানা ঝঞ্ঝাটে একটু ব্যস্ত ছিলাম এবং ভেবেছিলাম আপনাদের পাড়ায় আর আসবই না কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসতেই হল।

কমলবাবু সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা গলায় খেমটা সুরে গেয়ে উঠলেন :

আমি আর যাবো না তোদের পাড়ায়
পাখা বেচিতে।
পাখা বেচিতে হে নাগর,
মাজা দোলাতে।

আড্ডায় তখন ফূর্তির ফোয়ারা ছুটছে কিন্তু আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলাম ক্ষিতীশবাবু কেন এতদিন গা ঢাকা দিয়েছিলেন এবং কেন আবার আগমন। ব্যাপারটা আর কিছুই না, অর্থকরী। এতদিন বেকার ছিলেন, হাতে টাকা ছিল না তাই

আসেননি। হঠাৎ কিছু রোজগার হয়েছে, সোজা চলে এসেছেন আড্ডায়।

গল্পগুজব চলছে, এরি ফাঁকে অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে ক্ষিতীশবাবু আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন—একটি মাসিক পত্রিকা বার করছি, আপনার সাহায্য চাই।

নতুন পত্রিকা প্রকাশের শুভ সংবাদে আমার উৎসাহ কারো চেয়ে কম নয় আর সে-পত্রিকা যখন ক্ষিতীশবাবু বার করছেন। ক্ষিতীশবাবু আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর প্রয়োজনে আমি যদি কোনো কাজে লাগতে পারি সেটা তো আমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। পরামর্শ আর উপদেশের মামুলি কথায় না গিয়ে বললাম—লেখক জোগাড় করে দেবার কথা বলছেন তো?

—না সে-কাজ আমি নিজেই করব।

উত্তর শুনে আমি হতভম্ব। কথাটাতো ঠিকই। দেশ পত্রিকার আড্ডায় যে-সব সাহিত্যিকদের নিত্য আনাগোনা, তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই ক্ষিতীশবাবুর অত্যন্ত হৃদ্যতার সম্পর্ক। সুবোধ ঘোষ, বিমল মিত্র, সমরেশ বসু, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, গৌরকিশোর ঘোষ, সুশীল রায় প্রভৃতি সবাই তাঁকে আন্তরিক ভালোবাসেন, এমন কি অগ্রজ সাহিত্যিকরাও ক্ষিতীশবাবুকে স্নেহের চোখে দেখেন। সুতরাং লেখা পেতে তাঁর কোনো অসুবিধাই হবে না। আমি শুধু গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগলাম তাহলে আমি ওঁর আর কোন কাজে লাগতে পারি।

আমাকে চিন্তান্বিত দেখে ক্ষিতীশবাবু বললেন, আমার পত্রিকায় আপনার লেখা চাই এবং নিয়মিত প্রতি মাসেই চাই।

চমকে উঠলাম। আমার লেখা! তাও আবার প্রতি মাসে? ক্ষিতীশবাবু বোধ হয় আমার সঙ্গে পরিহাস করছেন। আমি লেখক নই, কস্মিনকালে লেখার অভ্যাসও আমার নেই। লেখকদের লেখা খুঁজে বেড়ানোই আমার নেশা ও পেশা, নিজের

লেখার কথা কোনোদিন চিন্তাই করিনি। ক্ষি
পাত্র নন। বললেন, আমাদের আড্ডায় '
সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা ..
বলেছেন। সেই লেখাই আমি আপনার কাছ থেকে চ.

কী কুক্ষণেই ক্ষিতীশবাবু এই সময়ে কথাটা পাড়লেন মেজাজে থাকলে আমি তখন অন্য মানুষ। অনেক কিছু সুপ্ত বাসনা ও কামনা তখন স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে ওঠে। যে হীনতা-বোধ কিছুকাল ধরে আমার অন্তরে বাসা বেঁধে আমাকে জর্জরিত করছিল ক্ষিতীশবাবুর প্রস্তাবে এক নিমেষে তা দূর হয়ে গেল। আমি রাজী হয়ে গেলাম।

সাহিত্যিকদের জীবনের অনেক কাহিনীর সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে জড়িত, অনেক কাহিনী আড্ডার বন্ধুদের মুখে শোনা। সে-কাহিনী যে আমাকে লিখতে হবে, তা ঘুণাক্ষরেও আমার মনে স্থান পায়নি। লেখা আদায়ের জন্য যে-অস্ত্র আমি এতকাল অন্যের উপর প্রয়োগ করে এসেছি, সেই অস্ত্রই যে ব্যুমেরাং হয়ে আমার উপরেই এমন মর্মান্তিকভাবে ফিরে আসবে তা কি কখনো ভেবেছিলাম? নাছোড়বান্দা ক্ষিতীশবাবুর নিত্য কড়া তাগাদার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার জন্য তাঁর সম্পাদিত 'জলসা' পত্রিকায় 'সম্পাদকের বৈঠকে' নাম দিয়ে একের পর এক লিখে গিয়েছি, তিন বছর ধরে তিনি তা চোখ-কান বুজে মাসের পর মাস ছেপে আমাকে লেখক বানিয়ে দিলেন।

কানাইদা তখন ত্রিবেণী নামে একটি পুস্তক প্রকাশনা শুরু করেছিলেন। আমার একান্ত শুভানুধ্যায়ী কানাইদা, যিনি অ-লেখক সাগরকে জোর করে লেখক-দলভুক্ত করে ডি ভি. সি. পরিক্রমায় পাঠিয়েছিলেন, হঠাৎ এসে বললেন, 'জলসা' পত্রিকায় তোমার যেসব লেখা বেরোচ্ছে আমি তা বই করে ছাপব। এই নাও কনট্রাক্ট ফর্ম, সই করো।

কানাইদার কথা চিরকালই আমার শিরোধার্য। অত্যন্ত সঙ্কোচ ও দ্বিধার সঙ্গে কম্পিত হস্তে কনট্রাক্ট সই করলাম, সঙ্গে সঙ্গে হাতে ধরিয়ে দিলেন এক হাজার টাকার একটা চেক। পরের লেখা নিয়ে যার কারবার, তাকে নিজের লেখার ফাঁসে এই প্রথম গলা দিতে হল, তিনি আমাকে গ্রন্থকার বানালেন।

ভোম্বলদার কীর্তিকথা

দীর্ঘকালের বিরতির পর পাঠকদের কাছে আবার উপস্থিত হচ্ছি। এবারে আর 'সম্পাদকের বৈঠকে' নয়, নতুন নামে। সাজ-বদল হলেও রূপ-বদল ঘটেনি। আমার এই বইয়ের নামের পরিবর্তন দেখে পাঠকরা যদি মনে করে থাকেন এর বিষয়বস্তুরও পরিবর্তন ঘটবে, তাহলে ভুল করবেন। 'সম্পাদকের বৈঠকে' ছিল সাহিত্যবিষয়ক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নানা কাহিনী, কখনো সাহিত্যিকদের জীবনের ঘরোয়া কথা। নূতন নামে যে লেখার সূত্রপাত হল, তাতে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের কথা তো থাকবেই, তবে এ-লেখার পরিধি কিঞ্চিৎ ব্যাপক। একটি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনা কাজে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার কিছু কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে 'সম্পাদকের বৈঠকে' নামের গ্রন্থে, বহু কাহিনী এখনও অলিখিত। সে-কাহিনীর উপর কালির কালিমা লেপন করার বাসনা আমার নেই, হয়তো সে-কাহিনী চিরকালই অলিখিত থেকে যাবে। তবু এমন অনেক ঘটনা আছে যা আড্ডায় বন্ধুদের কাছে শুনেছি, এমন অনেক চরিত্র দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, যে-চরিত্র থেকে সাহিত্যিকরা রসের উপাদান সংগ্রহ করে থাকেন, এমন অনেক মানুষকে আমি জেনেছি বাইরে থেকে দেখে যাদের আসল পরিচয় মেলে না, অন্তরঙ্গভাবে মিশলে দেখা যায় তাদের আরেক রূপ। আমি এদেরই একজনের কথা বলব।

আপনারা হয়তো বলবেন, লিখতে বসে এতখানি ভূমিকা কেন ফেঁদে বসলাম। আসলে উদ্দেশ্যটা ফাঁদ পেতেই বসা, পাঠক ধরবার জন্যে। 'সম্পাদকের বৈঠকে' পড়ে আপনারা

আনন্দ পেয়েছিলেন, ইনামও দিয়েছিলেন। এবার মুজরো নিয়েছি আসর জমাবার, অর্থাৎ আপনাদের খুশি করবার। কিন্তু আমার হাতের সম্বল তুরুপের সেই একটিই তাস, সম্পাদকের অভিজ্ঞতাই আমার সেই তুরুপের টেক্কা।

সেই পুরানো কথাই যদি শোনাব তাহলে এই নূতন নামে এত বাগাড়ম্বর কেন? এ প্রশ্ন নিশ্চয় ইতিমধ্যে আপনাদের মনে ঘাই মারছে। টোপ ফেলেছি, আপনারাও ঠোক্কর দিচ্ছেন, এখন গেঁথে তুলতে পারাটা আমার হাতযশ। নতুন নামকরণ হয়েছে বলে আমি অভিনব কিছু একটা আপনাদের সামনে উপস্থিত করব এমন অহঙ্কার আমার নেই। রসের কারবারে আমি মহাজনদের পদাঙ্কই অনুসরণ করছি মাত্র। অর্থাৎ পুরানো মদ নতুন বোতলে ঢেলে আপনাদের পরিবেশন করার প্রয়াসী, লেবেলটা শুধু বদলে দেওয়া হল।

মদের কথা উঠতেই মনে পড়ে গেল শালুকের ভোম্বলদার কথা। ঢের মাতাল দেখেছি কিন্তু ভোম্বলদার মত সেয়ানা মাতাল আমি আজও দেখিনি।

ভোম্বলদা একদিন বললেন—'আজ ভাই আমাকে একটু খেতেই হবে।'

সবাই অবাক। বছরের তিনশ পঁয়ষট্টি দিন ভোম্বলদা নেশা করেন, সেটা সবারই জানা। হঠাৎ আজ বিশেষ করে খাবার কী কারণ ঘটল।

প্রশ্ন করতেই ভোম্বলদা বললেন—'দেখছিস না, আজ কেমন খট্‌খটে রোদ্দুর উঠেছে।'

আরেকদিন ভোম্বলদা বললেন—'আজ কিন্তু আমার একটু না খেলে চলবেই না।'

এবারের অজুহাতটা কী শোনা যাক্‌। প্রশ্ন করা মাত্র ভোম্বলদা চোখ বড় বড় করে বললেন—'তোরা আবার কারণ

জিজ্ঞাসা করছিস ? দেখতে পাচ্ছিস না দিনটা কেমন মেঘলা হয়ে আছে।'

সুতরাং রোদ উঠলেও যাকে মদ খেতে হবে এবং না উঠলেও, এ-হেন ভোম্বলদা একদিন সন্ধ্যায় ওয়েস্টেন স্ট্রীটের ভাঁটিখানা থেকে চুর-চুর মাতাল হয়ে সেনট্রাল অ্যাভেনিউতে এসে দাঁড়িয়েছেন হাওড়াগামী ৩২ নম্বরের বাস ধরবার জন্য। পকেটে বাড়তি পয়সা নেই যে ট্যাক্সি ধরবেন আর থাকলেও ট্যাক্সি পাচ্ছেন কোথায়। ওসময়ে ভগবানকে খোঁজ করলে হয়তো মিলবে, ট্যাক্সি ?

অগত্যা সরকারী বাসই একমাত্র সম্বল। বাদুড়ঝোলা অবস্থায় মানুষভর্তি এক-একটা বাস আসে, ভোম্বলদার ওঠা হয় না। দু-একটা বাস-এ চেষ্টা করলে যে পাদানিতে দাঁড়ানো যায় না এমন নয়, কিন্তু কোন দরজা দিয়ে ঢুকবার চেষ্টা করবেন সেই পাঁয়তারা কষতে কষতেই বাস ছেড়ে দেয়। ভোম্বলদার মেজাজ তিরিক্ষি। স্টপেজে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ভোম্বলদার কসরৎ চলছে, ওদিকে নেশার বারোটা বাজার উপক্রম।

আবার একটা বাস ঝড়ের বেগে ছুটে এসেই স্টপেজে দাঁড়াল। ভোম্বলদা এবার মরিয়া হয়ে উঠলেন। যে-করে হোক বাস-এ চড়তেই হবে। কনুইয়ের গোঁত্তা মেরে লোকের পা মাড়িয়ে এবং প্রচুর গলাবাজি করার পর ভোম্বলদা বাসে উঠলেন। বাসসুদ্ধ লোক একটা বে-হেড্ মাতালকে ঐ অবস্থায় বাসে উঠতে দেখে ঘৃণায় ভুরু কুঁচকে উঠলো, কিন্তু ভোম্বলদার ভ্রূক্ষেপ নেই। গুঁতোগুঁতি করে এক ভদ্রলোকের পাশে বসে পড়লেন। যার পাশে বসলেন তিনি মাতালের ছোঁয়া বাঁচাবার জন্যে যথাসম্ভব কুঁকড়ে গেলেন, চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ।

বাসটা মোড় ঘুরে মিশন রোতে পড়তেই ভোম্বলদা পাশের সেই কাঠ হয়ে বসে থাকা ভদ্রলোককে উদ্দেশ করে কী যেন

একটা বিড়বিড় করে বললেন। কথা জড়িয়ে গেছে, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। কী বলতে চাইছেন তা বোঝা না গেলেও ভক্ করে দেশী মদের উগ্র গন্ধ বেরিয়ে আসতেই ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি রুমাল বার করে নাক চাপা দিলেন।

ভোম্বলদার তখন একটা জরুরী প্রশ্ন মাথায় ঢুকেছে, তার উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। এবার গলার স্বর আরেকটু পরিষ্কার করে জিভের জড়তা অনেকটা কাটিয়ে পাশের সেই ভদ্রলোককে আবার প্রশ্ন করলেন—'মশাই শুনছেন?'

পাশে উপবিষ্ট মহাশয় রুমালটা আরো জোরে নাকে চেপে ধরলেন, সাধ্যমত আরো একটু কুঁকড়ে গেলেন। কিন্তু ভোম্বলদার প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন না।

ভোম্বলদা ছাড়বার পাত্র নন। জরুরী প্রশ্ন, তাই উত্তর জানার জন্য তখন রোখ চেপে গিয়েছে। গলার স্বর আরেক ধাপ চড়িয়ে এবং মুখটা যথাসম্ভব ভদ্রলোকের কানের কাছে এনে বললেন—'বলি ও মশাই, শুনছেন?'

এবার আর ভদ্রলোক চুপ করে থাকতে পারলেন না। ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে। খ্যাক্ খ্যাক্ করে উঠলেন।

'শুনছি বৈকি। কী বলবার আছে বলুন না। যত্তো সব...'

ভোম্বলদার মুখের অভিব্যক্তির কোনো পরিবর্তন নেই। গলার স্বরকে যৎপরোনাস্তি মোলায়েম করে জড়িত কণ্ঠে বললেন, 'ও, তাহলে শুনছেন।'

'বললাম তো শুনছি।' একটা চাপা গর্জন।

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?' অমায়িক কণ্ঠস্বর।

'আঃ, কেন ভ্যাজর ভ্যাজর করছেন। যা বলবার বলুন না।' মেজাজ খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল ভদ্রলোকের।

ঢুলুঢুলু চোখে ভোম্বলদা আবার প্রশ্ন করলেন—'আচ্ছা, আমি কি উঠিচি ?'

এমন উদ্ভট প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক ভোম্বলদার দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে একবার তাকিয়েই চুপ মেরে গেলেন।

ভদ্রলোককে নিরুত্তর দেখে ভোম্বলদা আবার প্রশ্ন করলেন —'ও মশাই, আমি কি উ···ঠি···চি···?' 'চি' শব্দটার উপর জোর দিয়ে এবং যতটা সম্ভব টেনে লম্বা করে বলে ভোম্বলদা ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালেন। বাস-এ উঠতে পেরেছেন, ভোম্বলদার কাছে সেটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

ভদ্রলোক দেখলেন একটা কিছু উত্তর না দিলে লোকটা হুজ্জুত বাধাবে। পাগল আর মাতালকে বিশ্বাস নেই। কড়া মেজাজেই বললেন—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি উঠেছেন। এবার চুপ করে বসে থাকুন, বেশি কথা বাড়াবেন না।'

নির্বিকার চিত্ত ভোম্বলদা কারুর মেজাজের ধার ধারেন না। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা নিজের বুকের উপর ঠুকতে ঠুকতে বললেন—'আমাকে কি আপনি চেনেন ?'

'না, চিনি না এবং চিনবার দরকারও নেই।' রাগে গর-গর করতে করতে বললেন ভদ্রলোক।

এবারে মদ্যপানরত জীবানন্দের ভূমিকায় শিশির ভাদুড়ীর বাচনভঙ্গিতে ভোম্বলদা বললেন—'তা হলে কী করে জানলেন যে আমিই উঠিচি ?'

ভদ্রলোকের রুমাল তৎক্ষণাৎ নাকের উপর থেকে কোলে খসে পড়ল। বাসশুদ্ধ লোক অবাক হয়ে ভোম্বলদার দিকে তাকিয়ে।

আরেক সন্ধ্যায় খালাসীটোলায় বসে ভোম্বলদা আসর জমিয়েছেন। হঠাৎ বললেন—'তোরা তো কথায় কথায় আজকাল রবি ঠাকুর

কপচাস। বল দেখি দুটো লাইন যা তোদের রবি ঠাকুর ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো কবি আজ পর্যন্ত লিখতে পারেনি।'

আসরের তরুণ ছোকরা বললে—'কেন? মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

ধমক দিয়ে ভোম্বলদা বললেন—'তোরা যত সব বস্তাপচা লাইনগুলি মনে রেখেচিস। ওরকম তো ঝুড়ি ঝুড়ি আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন বললে—'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির—'

'থাম থাম। ও সব লাইন তোদের রবি ঠাকুর হাজার হাজার লিখে গেছেন এবং বাঁ হাতে লিখে গেছেন।'

সবাই হতভম্ব। তা হলে এমন কী লাইন লিখে গিয়েছেন যা ডান হাতে লেখা আর যা ভোম্বলদা ছাড়া আর কেউ বলতে পারছে না?

সবাইকে নিরুত্তর দেখে ভোম্বলদা বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন—'বলতে পারলি নে তো? তবে শোন।'

ভোম্বলদা এবার ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। গুন্‌গুন্ ক'রে একবার সুর ভেঁজে নিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় টপ্পার দানা এনে কাফি সুরে গেয়ে উঠলেন—

'জানতে চাও আমার উইশ কী?

একটি ছটাক সোডার জলে বাকি তিন পো হুইসকি।'

ভোম্বলদার কাণ্ড দেখে সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

গান থামিয়ে একটা চ্যালেঞ্জের ভাব দেখিয়ে ভোম্বলদা বললেন—'কোনো শালা কবি পারবে এমন লাইন লিখতে? কালিদাস ভবভূতি? শেক্‌সপীয়র মিলটন তো কোন ছার। তোরা জেনে রাখ, পৃথিবীতে রবি ঠাকুর একটিই জন্মায়।'

বলেই উর্ধ্বনেত্র হয়ে হাতজোড়া কপালে ঠেকালেন ভোম্বলদা।

সবাই বুঝলে নেশা চড়েছে ভোম্বলদার। কে তর্ক করতে যাবে এ সময়ে ওঁর সঙ্গে। ওটা যে একটা নাটকের সংলাপ তা বলতে গেলে আবার ধমক খেতে হবে। সুতরাং ঘাঁটিয়ে কাজ কি।

নীরবতা ভঙ্গ করে ভোম্বলদাই বলে উঠলেন—'তবে হ্যাঁ। আরেকজন উর্দু কবির একটা শায়ের মনে পড়ে গেল। সেটা প্রায় তোদের রবি ঠাকুরের কাছাকাছি যায়। আমীর খসরুর নাম শুনেছিস? শুনিসনি তো? তবে শোন তাঁর একটা বয়েৎ—

'রহেগা কৌন, ঔর রহেগী কিস্ কী?
রহেঙ্গে হাম, ঔর রহেগী হুইস্কি।'

ভোম্বলদা থামলেন। মুখে আত্মতৃপ্তির ভাব। সবাই বুঝে গেল এই দুই কবির ঐ কয়টি লাইন ভোম্বলদার জীবনের আদর্শ। এখন কোনো মন্তব্য করতে গেলেই জীবনদর্শন নিয়ে দীর্ঘ লেকচার শুনতে হবে।

এ-হেন ভোম্বলদা একদিন সকালে আপিসে ঢুকেই সহকর্মীদের কাছে ঘোষণা করলেন যে, জীবনে আর কোনোদিন কোনোরকম নেশা করবেন না।

॥ ২ ॥

ভোম্বলদা সেদিন বেলা এগারোটায় আপিসে ঢুকেই সবাইকে চমকে দিয়ে বললেন—'যাক, তোরা বেঁচে গেলি। তোদের ভোম্বলদার বারোটা বেজে গিয়েছে।'

ক্লাইব স্ট্রীটের এক মার্চেন্ট আপিসে রেকর্ড কীপিং ডিপার্টমেন্টে সিনিয়র ক্লার্ক ভোম্বলদা। ওঁরই নিচে আরো দুজন

আছে, রাখাল আর বাদল। বাহান্ন বছর বয়স হয়েছে ভোম্বলদার, আর তিন বছর বাদে রিটায়ার করবার কথা।

সংসারের ঝামেলা বলতে তেমন কিছুই নেই ভোম্বলদার। স্ত্রী আর এক বিধবা বোন। একটি মাত্র মেয়ে, চোদ্দ থেকে পনেরোয় পা দিতে-না-দিতেই বিয়ে দিয়ে দিলেন হাওড়া-আমতা রেলের এক গার্ডের সঙ্গে।

ছেলের বাপ মেয়ে নিয়ে যখন নিজের বাড়ি ফিরলেন, ছেলের মা মেয়ের গায়ের গয়না প্রথমে গুনে গুনে দেখেই চীৎকারে পাড়া মাথায় তুললেন, গয়না নিশ্চয় কম দিয়েছে।

খবর দিতেই পাড়ার স্যাকরা ছুটে এল। গা থেকে একে একে সব গয়না খুলে ওজন করা হল। আট ভরির জায়গায় সাড়ে চার ভরি।

পরদিনই ছেলের বাপ মেয়ের বাপকে জানিয়ে দিলেন, জোচ্চোরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক তাঁরা রাখতে চান না, সুতরাং মেয়েকে তাঁরা কোনদিন বাপের বাড়ি পাঠাবেন না।

ভোম্বলদারও আত্মসম্মানবোধ টনটনে। আজ অবধি কোনদিন ছেলের বাপকে খোসামোদ করেন নি মেয়েকে বাপের কাছে পাঠাবার জন্য।

ভোম্বলদার পাড়ার লোকে বলে, এই ঘটনার পর থেকে সেই যে মদ ধরলেন ভোম্বলদা, আজ তা তাঁর নিত্য প্রয়োজনীয় অনুপান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ-সব কাহিনী রাখাল বাদল, ডেসপাচ ক্লার্ক নরেন সবাই জানে। আর এ-ও জানে, এই সর্বনাশী নেশার জন্যে ভোম্বলদা আজ সর্বস্বান্ত। দেনা প্রায় প্রত্যেকের কাছেই কিছু-না-কিছু আছে।

রাখাল বাদলের দল জানে, সে-দেনা কোনোকালেই শোধ হবে না। একদিক দিয়ে তারা নিশ্চিন্ত। রোজ বিকেলে

আপিসের ছুটি হলেই ভোম্বলদা আর বলতে পারেন না—দে দেখি পাঁচটা টাকা, কাল আপিসে এসেই ফেরত দেব।

ভোম্বলদা জানে, বাদলের কাছে টাকা চাইলেই ও বলবে—'এ পর্যন্ত বারো টাকা পাওনা হয়েছে ভোম্বলদা, সেটা ফেরত পেলেই...'

অগত্যা আপিসের দারোয়ানের কাছে চড়া সুদে টাকা ধার করতে হয় ভোম্বলদাকে। মাসের প্রথম দিন মাইনে পেলেই সুদ সমেত আসল শোধ না করলে আর রক্ষে নেই। আপিসের নিচে পানওয়ালা আছে আরেক পাওনাদার। তার কাছেও বেশ কিছু টাকা ধার নেওয়া আছে, শোধ করার নাম নেই। পান সিগারেট খেতে আপিসের লোক যে আসবে তার কাছেই পানওয়ালা ভোম্বলদার নামে অভিযোগ জানাবে। আপিসের হেন লোক নেই যার কাছ থেকে ভোম্বলদা টাকা ধার করেননি, হেন লোক নেই যে ভোম্বলদার এই স্বভাব জানে না।

আপিসে ঢুকেই সবাইকে চমকে দিয়ে ভোম্বলদা যখন ওঁর বারোটা বেজে যাবার সংবাদ ঘোষণা করলেন, রাখাল বাদল নরেনের দল প্রথমে বেশ খানিকটা হকচকিয়ে গেল। ভোম্বলদা বলে কি!

নিজের চেয়ারে বসে ভোম্বলদা হাঁপাতে লাগলেন। শরীর যে সুস্থ নয় সবাই তা বুঝতে পারল। ঘরের বেয়ারা বংশীকে ডেকে ভোম্বলদা বললেন—'ছুটির দরখাস্তর একটা ফর্ম এনে দে।'

ডেসপাচ ক্লার্ক নরেন বললে—'ভোম্বলদা কি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন?'

'আর বলিস কেন।' দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন ভোম্বলদা:—'ধড়ফড়ানি'

'ধড়ফড়ানি?'

'হ্যাঁ, বুক ধড়ফড়ানি! কাল রাত্রে হঠাৎ গা দিয়ে ঘাম

ছুটতে লাগল, যাই-যাই অবস্থা। তোদের বৌদি ছুটে গিয়ে পাড়ার কালী ডাক্তারকে ডেকে আনলে; ইনজেক্শন পড়ল, ওষুধ খাওয়ালে আর বললে—কমপ্লিট রেস্ট।'

রাখাল বাদল নরেনের চোখেমুখে বিস্ময়।

'কাল রাত্রে যখন ঐ অবস্থা গেছে, আজ সকালেই আপিসে চলে এলেন? বৌদি আসতে দিলেন আপনাকে?'

'সে কি দেয়, অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ট্যাক্সি করে যাবো আর আসবো এইসব বলে রাজী করিয়েছি।'

বাদল বললে—'আপনার আসবার দরকারটাই বা কি ছিল। মুরারী তো আপনার পাড়াতেই থাকে, তাকে দিয়ে একটা খবর পাঠিয়ে দিলেই তো হত।'

অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টের মুরারী শাল্কেরই ছেলে, ভোম্বলদার পাড়াতেই থাকে। পাড়ায় নামকরা মাতাল বলে ভোম্বলদার খুব বদনাম, মুরারী সেই ভয়ে পারতপক্ষে ভোম্বলদার সঙ্গে মেলামেশা করে না।

ভোম্বলদা বিরক্তির সঙ্গে বললেন—'না, খবর পাঠিয়ে দিলেই হত না।'

রাখাল আর বাদল জানে যে, আপিসের কোনো কাজই প্রায় ভোম্বলদাকে করতে হয় না, ওরা দুজনে সে-কাজ করে দেয়। সুতরাং কাজ বুঝিয়ে দেবার প্রশ্ন নেই। ছুটির দরখাস্ত? ওটা একটা অজুহাত। বাড়ি বসে চিঠিতে দরখাস্ত পাঠালেই চলত।

ওরা অনুমানে বুঝে নিলে, সশরীরে আপিসে চলে আসার আসল কারণটা কী। টাকার দরকার। কথাটা খুলে বলতে বোধ হয় ভোম্বলদা সঙ্কোচ বোধ করছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় কি।

অবশেষে ভোম্বলদাই কথাটা পাড়লেন। বললেন—'আজকাল ডাক্তারগুলোও হয়েছে তেমনি। পাড়ার ডাক্তার বহুকালের

জানাশোনা, তাই ভিজিট দিই না। তাই বলে দ
ফিরিস্তি দিয়ে দমকা খরচ করিয়ে দেওয়া!'

রাখাল অনুকম্পার সুরে বললে—'ডাক্তারের উপ
অযথা রাগ করছেন ভোম্বলদা। হার্টের ব্যামো, ক
বলা যায় না। ওষুধপত্র নিয়মিত খেতে হবে বৈকি।'

খেঁকিয়ে উঠলেন ভোম্বলদা—'মেলা ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্‌ করিস না রাখাল। তোদের মুখে হিতোপদেশ শুনলে আমার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত দম-দেওয়া গাঁজার কল্কের মত দাউ-দাউ জ্বলতে থাকে, ফাটবো-ফাটবো ভাব।'

প্রচণ্ড ধমক খেয়ে রাখাল বাদল নরেন একেবারে চুপসে গেল। একে বুক ধড়ফড়ানি, তার উপর মেজাজ আসমানে চড়েছে। আর ঘাঁটানো উচিত হবে না। যে-যার কাগজপত্র টেনে নিয়ে কাজে মন দিলে।

ছুটির দরখাস্তর ফর্ম নিয়ে বেয়ারা বংশী এসে হাজির। নিঃশব্দে ফর্মটা হাতে নিয়ে সাত দিনের ছুটির দরখাস্ত লিখে দিলেন, ডাক্তারের সার্টিফিকেটটাও সঙ্গে গুঁজে দিয়ে বংশীকে বললেন—'যা, বড়বাবুকে দিয়ে আয়।'

বংশী চলে গেল। রাখাল বাদল নরেনের মুখে কোনো কথা নেই, ঘাড় গুঁজে তিনজনে কাজ করে চলেছে। ভোম্বলদা কিছুক্ষণ চুপচাপ কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থেকে সমানে পা নাচাতে লাগলেন। ছুটির দরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছে, আপিসের কাজ যা বুঝিয়ে দেবার তা তো বাদল আর রাখালের আগেই জানা। তবু নিরর্থক ভোম্বলদা চুপচাপ কেন বসে, বাড়ি চলে গেলেই তো পারেন।

ভোম্বলদার হাবভাবে বাড়ি যাবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে কলম পেন্সিল আলপিন পেপার-ওয়েট সব ভরে ফেললেন। এ-কাজ রোজ বংশীই করে, আজ

ভোম্বলদা নিজের হাতেই তা সেরে রাখলেন। ভাবখানা যেন, ঝাঁপ বন্ধ হল, এবার উঠলেই হয়। না, ওঠার কোনো লক্ষণ নেই। বাদল আড়চোখে সবই লক্ষ্য করছিল। এতক্ষণ ধরে যে-কথাটা বলবার জন্য ভোম্বলদা হাঁকুপাঁকু করছিলেন, মনে জোর এনে সব সঙ্কোচ কাটিয়ে কথাটা বলেই ফেললেন।

'হ্যাঁরে বাদল, কুড়িটা টাকা জোগাড় করে দিতে পারিস?' কথাটা বলার মধ্যে একটা করুণ সুর ফুটে উঠল। ভোম্বলদা কাতর চোখে বাদলের মুখের দিকে তাকিয়ে, একটা আশাপ্রদ উত্তরের আকুতি তাঁর দুই চোখে।

বাদল অবিশ্বাস করতে পারল না। বুঝতে পারল সত্যি সত্যিই দামী ওষুধ লিখে দিয়েছে ডাক্তার, কিন্তু কিনবার মত টাকা নেই হাতে।

বাদল এবার অভিমানের সুরে বললে—'এই কথাটা আগে বললেই তো হত ভোম্বলদা, মিছিমিছি আমাদের উপর মেজাজ করলেন। আমরাও তো এই কথাই বলতে চাইছিলাম। দামী ওষুধপত্র যখন, প্রয়োজন হলে আমরা নিশ্চয় জোগাড় করে দেব।'

মুখে একটা পরম তৃপ্তির হাসি এনে ভোম্বলদা বললেন—'জানি জানি, তোরা ছাড়া আমার কে আছে বল। আর হতভাগা কেষ্ট, ওই তো যত নষ্টের গোড়া। রোজ বিকেলে আপিস থেকে বেরোবার মুখে আমার পিছু নেবে আর কানের কাছে মন্তরের মত জপ করতে থাকবে—একটু ঘুরে গেলে হত না ভোম্বলদা। এই করেই তো আজ আমার এই হাল। বিপদে-আপদে তোদের কাছে যে দু-চার টাকা ধার চাইব তারও মুখ রাখেনি ঐ বেটাচ্ছেলে কেষ্ট।'

এ কথা এর আগেও বহুবার শুনেছে ভোম্বলদার মুখে। যত দোষ ঐ টাইপিস্ট কেষ্টার। যেন কেষ্টা বেটাই চোর। বিকেল

পাঁচটা বাজতে না বাজতে কেষ্টর দেখা পাবার জন্যে ভোম্বলদার সে কী আকুলি-বিকুলি। তা আর রাখাল বাদল নরেন জানে না? এই সেদিন ওয়েস্টেন স্ট্রীটের ভাঁটিখানা থেকে বেরিয়ে হেয়ার স্ট্রীট থানার সামনের মাঝরাস্তায় কেষ্টর গলা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভোম্বলদা। দুজনেই চুরচুর মাতাল। দু পাশ থেকে গাড়ি অনবরত হর্ন মারছে। চাপা না দিলে কোনো গাড়ির যাবার উপায় নেই। গালিগালাজ, চীৎকার, লোকজন, হৈচৈ। নির্বিকারচিত্তে তখনো দুজনে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে।

গোলমাল শুনে থানা অফিসার ছুটে এসে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন—'মাতলামি করার আর জায়গা পেলেন না? রাস্তা ব্লক করেছেন কেন?'

জড়িত কণ্ঠে ভোম্বলদা বললেন—'ইউনাইটেড উই স্ট্যাণ্ড, ডিভাইডেড্ উই ফল্।'

আর বলতে হল না। দুজনকেই গলাধাক্কা দিয়ে হেয়ার স্ট্রীট থানায় নিয়ে ভরলেন থানা অফিসার।

সেদিনের পর থেকে কেষ্ট সব সময় চেষ্টা করে ভোম্বলদাকে এড়িয়ে চলতে, কিন্তু বিকেল হলেই কেষ্টকে না দেখলে অন্ধকার।

কেষ্টার উপর সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে ভোম্বলদা চুপ করলেন। রাখাল বাদল নরেনের মধ্যে চোখাচোখি হতেই তারা হেসে ফেললে।

ভোম্বলদার দৃষ্টি এড়ায়নি। বললেন—'তোরা হাসিহাসি করছিস বটে কিন্তু তোদের বৌদির কি ধারণা জানিস তো? ওর ধারণা কেষ্টই যত নষ্টের মূল।'

বাদল বললে—'এ কিন্তু আপনার অন্যায় ভোম্বলদা। আপনি নিশ্চয় বৌদিকে তাই বুঝিয়েছেন। তা না হলে উনি ওরকম ধারণা পোষণ করবেনই বা কেন।'

ভোম্বলদা চোখ বিস্ফারিত করে বললেন—'আমি বলতে যাব কেন, ও নিজেই বাহাদুরি করতে গিয়ে অমন ধারণা করিয়ে দিয়েছে।'

ডেসপাচ ক্লার্ক নরেন ভোম্বলদার কথার প্রতিবাদ না করে পারল না।

'আপনি মিছিমিছি কেষ্টর উপর দোষ চাপাচ্ছেন। ও বেচারী নেহাত ভালো মানুষ। আসলে বৌদির কাছে গালমন্দ খাবার ভয়ে দোষটা এর ওর তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াই আপনার স্বভাব।'

ভোম্বলদা নরেনের কথা শুনে রাগ করা দূরে থাক হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে বললেন—'তাহলে শোন। তোদের ভালোমানুষ কেষ্টর ফিচলেমি বুদ্ধিটা শোন। এই গেল পয়লা বৈশাখের দিন বিকেলে আপিস থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরব মনস্থির করে হাওড়ার ট্রাম স্টপেজের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। পশ্চিম আকাশে কালো মেঘ জমাট বেঁধে আছে। কালবৈশাখী ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ। হঠাৎ কোথা থেকে কেষ্টা হন্তদন্ত হয়ে এসেই কানের কাছে মন্ত্র জপ করা শুরু করে দিলে।

—'ভোম্বলদা, দেখেছেন কী রকম মেঘ করেছে।'

—'হুঁ, দেখেছি।'

—'এখুনি কিন্তু প্রচণ্ড ঝড় উঠবে।'

—'তা উঠুক। হাওড়া যাবার ট্রামও এসে পড়ল বলে।'

—'বৃষ্টিও হবে জোর। দেখছেন না এক ফোঁটা হাওয়া নেই, তার উপর ভ্যাপসা গরম।'

ভোম্বলদা কথা থামিয়ে রাখাল বাদল আর নরেনের মুখের দিকে তাকালেন।

'বুঝেছিস, কেষ্টাকে তখন নেচার স্টাডিতে পেয়ে বসেছে। কানের কাছে অনবরত ভ্যাজর ভ্যাজর করে বোঝাতে লাগল,

—প্রচণ্ড ঝড় আসছে, সাক্ষাৎ কালবৈশাখীর ঝড়। সাংঘাতিক বৃষ্টি হবে, জলে ভেসে যাবে কলকাতা শহর। রাস্তায় এক কোমর জল। ট্রাম-বাস বন্ধ। রিক্‌শা ভাড়া চাইবে চার টাকা, ইত্যাদি বলে আমায় কিনা উপদেশ দিচ্ছে পথে কোথাও যেন বসে না পড়ি, ট্রাম এলেই যেন সোজা হাওড়া ইষ্টিশানে নেমে বাস ধরে শাল্‌কে চলে যাই।'

এক নাগাড়ে কথাগুলি বলে ভোম্বলদা একটু দম নিয়ে বললেন—'বুঝলি কিছু ?'

বাদল বললে—'কেষ্টা তো ভালো কথাই বলেছিল।'

চোখ পাকিয়ে ভোম্বলদা বললেন—'এটাকে তুই বলছিস ভালো কথা ! ওর শয়তানি বুদ্ধিটা দেখলি না ! পাগলাকে পোল না নাড়াবার গল্পটা জানিস তো। কেষ্টার মতলবটা ছিল তা-ই !'

এর মধ্যে মতলব কি থাকতে পারে ভেবে পেল না রাখাল বাদল নরেন। ওরা ভোম্বলদার মুখের দিকে হতবাক দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

কৌতূহল চাপতে না পেরে রাখাল বললে—'তারপর কি হল, সত্যি সত্যিই বাড়ি চলে গেলেন ?'

ধমকে উঠলেন ভোম্বলদা—'মাছিমারা কেরানীর কাজ করে করে তোরা কি বুদ্ধিসুদ্ধি সব খুইয়ে বসে আছিস ? হবে আবার কি। যা হবার তাই হল।'

বিস্মিত বাদল বললে—'সত্যিই কোথাও গিয়ে জমে গেলেন ?'

'জমা মানে কি। হাওড়া ব্রীজের এ-পাশে বাঁদিকে গঙ্গার ধারের ভাটিখানায় গিয়ে সবে বসেছি, এল তুমুল ঝড় আর বৃষ্টি। ব্যস, শুরু হয়ে গেল আউন্সের পর আউন্স। বৃষ্টি যখন থামল তখন রাত্তির নটা। ততক্ষণে আমাদের চল্লিশ আউন্স পার হয়ে গেছে।'

বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে ডেসপাচ ক্লার্ক নরেন বললে—'কেষ্ট আপনার সঙ্গে ছিল? সে আপনাকে বারণ করল না?'

ভোম্বলদা বললেন—'এতক্ষণ তোদের তাহলে বলছি কি। অনেক ফিচেল দেখেছি, কেষ্টার জুড়ি মেলা ভার। কেষ্টাকে আমি পইপই করে বললাম—দেখ কেষ্টা, তোর বৌদির কাছে কিরে কেটেছি যে আজ বচ্ছরের প্রথম দিনটা ও-সব করব না।'

শুনে কেষ্টা শুধু বললে—'ভোম্বলদা, একবার কাশুন তো।'

শোনো কথা। সর্দি কাশি কিছুই আমার হয়নি, খামকা কাশতে যাব কেন?

কেষ্টা তবু ছাড়ে না। বার বার বলতে লাগল, কেশেই ফেলুন না একবার।

কেষ্টার কথায় ওর অনুরোধে আর উপরোধে শুক্‌নো গলায় খক্ খক্ করে কেশে ফেললুম।

কেষ্টা নিশ্চিন্ত হয়ে বললে—'যাক, দোষ কেটে গেল।'

'দোষ কেটে গেল মানে?' অবাক হয়ে কেষ্টাকে প্রশ্নটা করতেই ও বললে—

'কিরা কাটলে সে কিরা কাটান দেবার বিধান আছে আমাদের শাস্ত্রে। আমাদের মৈমনসিং-এ একটা ছড়া আছে—

নদীর জলে কাইশ্যা
কিরা গেল ভাইস্যা।

সাক্ষাৎ মা গঙ্গার সামনে বসে আপনি কেশেছেন, সব পাপ স্খালন হয়ে গেল।'

ভোম্বলদার মুখে এ ঘটনা শুনে বাদল রাখাল আর ডেসপাচ ক্লার্ক নরেন একেবারে ভোম মেরে গেল। ওদের মুখে আর কোনো রা নেই।

সুযোগ পেয়ে ভোম্বলদা বললেন—'কি, তোদের ভালো মানুষ কেষ্টর পক্ষে আর কোনো ওকালতি করবার আছে কি?'

লজ্জিত হয়ে নরেন বললে—'এ-কথা শোনার পর আমার কথা প্রত্যাহার করলাম ভোম্বলদা।'

ভোম্বলদা হন্‌হন্‌ করে করিডর ধরে চলে গেলেন, রাখাল বাদল আর ডেসপাচ ক্লার্ক নরেন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

খবরটা মুরারীই এনে দিল, সেই শাল্‌কের মুরারী। ভোম্বলদার সম্পর্কে এ রকম একটা মারাত্মক খবর শুনতে হবে, রাখাল বাদল আর নরেন তা কোনোদিন কল্পনাই করতে পারেনি।

ভোম্বলদা সেই যে গেলেন তারপর দিন-চার আর কোনো খবর নেই। ওরা জানে ভোম্বলদা খাচ্ছেন-দাচ্ছেন পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন—সুতরাং ভালোই আছেন। ভালোমন্দ কিছু একটা হলে অন্তত আপিসে একটা খবর আসতই।

সেই খবরই নিয়ে এল মুরারী।

একই পাড়ার ছেলে মুরারী, একই আপিসে চাকরি করে। ভোম্বলদার অসুখের খবর মুরারী শুনেছিল। সেদিন রবিবার। বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে ডিস্পেন্সারীর কাছে এসে দেখে ডাক্তার-বাবু বসে আছেন। খেয়াল হল, ভোম্বলদার খবরটা একবার নিলে হয়।

ডাক্তারবাবু বললেন—'আপনাদের ভোম্বলদার মতো এরকম নেশাখোর লোক আমি দেখিনি মশাই। এসব লোকের চিকিৎসা করাও এক ঝকমারি। গতকাল হঠাৎ ওঁর স্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে হাজির। কী ব্যাপার! হার্টের ট্রাবল্ আবার বাড়ল নাকি! জিজ্ঞাসা করতেই ওঁর স্ত্রী বললেন—হার্টের ব্যামো এখন আর সেরকম কিছু নেই, তবে মাথার ব্যামো দেখা দিয়েছে।'

'মাথার ব্যামো মানে?'

'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, এমনিতে তো ভালোই ছিলেন, হঠাৎ ক'দিন ধরে ওঁর মাথার একটু গোলমাল শুরু হয়েছে। সারাদিন দরজা জানলা বন্ধ করে ঘরেই শুয়ে থাকেন, কোনো ঝামেলা নেই। শুধু থেকে-থেকে গরম জল চেয়ে পাঠান। বলেন, এক কাপ গরম জল দাও দাড়ি কামাবো।'

আমি যত বলি—'সে কী, সকালে দু-দুবার দাড়ি কামালে, আবার দাড়ি কামাবে কি। ও বলে—কই না তো, কোথায় দাড়ি কামালাম, এখন কামাবো, শিগগির গরম জল দাও। আমার সন্দেহ হচ্ছে ওঁর নিশ্চয় মাথাটা খারাপ হয়েছে। ডাক্তারবাবু, আপনি একবার দেখবেন চলুন।'

যেতে হল ডাক্তারবাবুকে। ভোম্বলদা দিব্য আদর আপ্যায়ন করলেন, কথাবার্তায় বেচাল কিছুই দেখলেন না। বুক পিঠ পরীক্ষা করলেন, রক্তের চাপও দেখলেন, অপেক্ষাকৃত অনেক ভালো। মাথার গোলমালটা কোথায়!

ভোম্বলদার স্ত্রী ডাক্তারবাবুর জন্যে চা করে আনতে রান্নাঘরে ঢুকতেই গলাটা খাটো করে ভোম্বলদা ডাক্তারবাবুকে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন—'আপনি যা অনুমান করছেন ডাক্তারবাবু, সে-সব কিছুই নয়। মাথা আমার ঠিকই আছে। আপনি গরমজল দিয়ে দু-এক আউন্স ব্র্যাণ্ডি খেতে বলেছিলেন কি না, তাই দাড়ি কামানোর নাম করে গরমজলটা একটু ঘন ঘন চেয়েছিলাম বলেই এই বিভ্রাট।'

সব বৃত্তান্ত মুরারীকে বলেই ডাক্তার বললে—'আপনাদের ভোম্বলদার চিকিৎসা করা আমার কম্মো নয়।'

মুরারীর কাছে এ-ঘটনা শুনে রাখাল বাদল আর ডেসপাচ ক্লার্ক নরেনের চোখ ট্যারা।

॥ ৩ ॥

মাসের প্রথম দিন ভোম্বলদা আপিসে এলেন একটু বেলা করেই। রাখাল বাদল আর ডেসপাচ ক্লার্ক নরেন জানত যে, ভোম্বলদা আজ আপিসে একবার আসবেন। ছুটিও ফুরিয়েছে, তদুপরি আজ আবার মাইনে নেবার দিন।

ভোম্বলদা ঘরে ঢুকেই একবার বাদল রাখাল আর নরেনের দিকে চোখটা বুলিয়ে নিলেন। ওরা তিনজন তখনো একমনে কলম পিষে চলেছে, ভোম্বলদা ঘরে ঢুকেছে দেখেও যেন না-দেখার ভান। মুরারীর কাছে ভোম্বলদার কীর্তিকাহিনী শোনার পর থেকে ওরা তিনজন স্থির করেছিল যে, ভোম্বলদার নেশাসংক্রান্ত আর কোনো প্রশ্নই ওরা করবে না। কিন্তু ওই একটি প্রসঙ্গ ছাড়া ভোম্বলদার আর অস্তিত্বই বা কী। ও-প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া মানে ভোম্বলদার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা।

ভোম্বলদার কাছে সেইটিই ছিল চরম অবজ্ঞার নিদর্শন। ভোম্বলদা প্রায়ই দুঃখ করে বলতেন—'দেখ্ বাদল, জীবনে অনেক আড্ডায় মিশেছি, অনেক লোকের সঙ্গে বসে নেশা করেছি, কিন্তু সত্যিকারের খানদানী রসিক আজও খুঁজে পেলাম না।'

কথাটা বলার মধ্যে ভোম্বলদা এমন একটা ভাব দেখালেন যেন হঠাৎ ভগবানের ডাক শুনতে পাওয়া লোক সংসার-বিরাগী হয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মনের মতো গুরু পাবার আশায়, কিন্তু পাচ্ছেন না। ভোম্বলদার বক্তব্য হচ্ছে ওঁর নিজের জীবনে নিত্য-নৈমিত্তিক নেশা করার মূল কারণ—ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশপাথর।

ভোম্বলদা একদিন পরশপাথর খুঁজে পেয়েও ছিলেন এবং নিজেরই হঠকারিতার দোষে হারিয়েছিলেন।

পেয়েছিলেন সেই খালাসীটোলাতেই। এক সন্ধ্যায় ভোম্বলদা সেখানে গিয়ে দেখেন একতলায় টিনের ছাউনি দেওয়া চত্বরটায় লোকে লোকারণ্য, বসবার জায়গা পর্যন্ত নেই। তার উপর চেঁচামেচি হট্টগোল। সিঁড়ি বেয়ে দোতলার ছোট্ট ঘরটাতে উঠে গিয়ে দেখলেন, লম্বা টেবিলটার একপাশে এক বৃদ্ধ ধ্যানস্থ হয়ে একা বসে আছেন। পাকা লাঠির মতো লম্বা কালো কুচকুচে শরীর, মাথায় প্রশস্ত টাক, সাদা গোঁফজোড়া চোয়ালের দু-পাশে ছুঁচের ডগার মতো সরু হয়ে বেরিয়ে আছে।

টেবিলের উপর একটি সোডার বোতল খোলা, এক ফোঁটাও সোডা ঢালা হয়নি। পাশে বিশ আউন্সের বোতল, তার তলানিতে আউন্স দুই তখনো বাকি।

দোকানের ছোকরা মোহন উপরে এসেছে কার কি লাগবে খবর নিতে। ভোম্বলদার কাছ থেকে অর্ডারমাফিক টাকাকড়ি নিয়ে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে মোহন বললে—'কি শ্যামবাবু, সোডাটা তো পুরোই রয়েছে। আর কয় আউন্স আনবো।'

এতক্ষণে ধ্যানভঙ্গ হল বৃদ্ধের। টেবিলের উপর একটা কাগজের টুকরোয় কিছু নুন আর আদা আছে। এককুচি মুখে ফেলেই শ্যামবাবু বললেন—'দে আর দশ আউন্স, পয়সা দিয়ে সোডা কিনেছি, ফেলে তো দিতে পারিনে।'

বোতলের তলানিটা গেলাসে ঢেলে বোতলটা ছোকরার হাতে তুলে দিলেন, সেই সঙ্গে দশ আউন্সের দামও। এক চুমুকে গেলাসের নির্জলা নির্ভেজাল তরল বস্তুটি নিঃশেষ করেই পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরালেন। কোনো চিত্ত-চাঞ্চল্য নেই, নির্বিকার ধীর স্থির। সোডার বোতলে হাতও লাগালেন না, যেমন ছিল তেমনি আছে।

ভোম্বলদা বুঝে গেলেন এতদিনে বোধ হয় একজন গুরুর সন্ধান পেলেন। বৃদ্ধের কাছ ঘেঁষে বসেই ভোম্বলদা সবিনয়ে বললেন—'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে শ্যামবাবু বললেন—'বলুন।'

'আপনার বয়স কতো জানতে পারি?'

'তা সত্তর পার হয়েছে।'

শুনে ভোম্বলদার মত চালু লোকও ভোম্ মেরে গেলেন। আর কোনো কথা নেই।

ভোম্বলদাকে চুপ মেরে যেতে দেখে শ্যামবাবু বললেন—'কি ভায়া, বয়সটা শুনে চুপ মেরে গেলেন যে। আমাকে আর কি দেখছেন, দেখতেন যদি আমার বাবাকে। সতেরো বছর বয়সে নেশা ধরেছিলেন বেঁচে ছিলেন নব্বই বছর বয়স পর্যন্ত। কোনো দিনও কামাই যেত না, কোনো দিনও ওঁর পা টলতে দেখিনি।'

ভোম্বলদা অবাক হয়ে বললেন—'তা হলে তো দেখছি আপনি বাপ-কা-বেটা সিপাহি-কা-ঘোড়া। তা আপনি কবে থেকে এ-সব শুরু করেছেন?'

শ্যামবাবু ধ্যানস্থ হয়ে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন—'তা যা বলেছেন। আমাদের স্কুলের ফুটবল টিম গিয়েছিল শিবপুরে একটা টুর্নামেণ্ট খেলতে। আমি বরাবরই রাইট-ইন-এ খেলতাম। পাঁচ গোলে জিতেছিলাম। তার মধ্যে তিনটি গোল আমি নিজেই দিয়েছি। খেলাশেষে ফুর্তিফার্তি করে যখন বাড়ি ফিরেছি তখন দশটা বেজে গিয়েছে। একটা সরু গলি পার হয়ে আমাদের বাড়ি, আমার তখন এমন অবস্থা যে গলির এ দেয়ালে একবার ঠোক্কর খাচ্ছি, ও দেয়ালে আরেকবার। বাড়ির

সদর দরজাটা ভেজানোই ছিল, ধাক্কা দিয়ে খুলতেই দেখি বাবা দাঁড়িয়ে। ধরা পড়ে গেলুম।'

শ্যামবাবু থামলেন, সিগারেটে সুখ-টান দিয়ে সেটা ফেলে দিলেন। দশ আউন্সের বোতল থেকে অর্ধেকটা গেলাসে ঢেলে এক চুমুকে তা শেষ করলেন, সোডার বোতলে হাত লাগালেন না।

ভোম্বলদা জেনে গেলেন এতদিনে একটি খাঁটি মাতালের সন্ধান তিনি পেলেন। কিন্তু বাবার কাছে ধরা পড়ার পর কী হল তা জানার কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে বললেন—'ধরা পড়ে খুব প্রহার খেয়েছিলেন তো?'

শ্যামবাবু বললেন—'প্রহার হয়েছিল, তবে নেশা করার জন্যে নয়।'

অবাক হয়ে ভোম্বলদা বললেন—'তার মানে? আপনিও লুকিয়ে চুরিয়ে নেশা ধরেছেন আপনার বাবা তা জানতেন?'

'না, জানতেন না। সেদিনই প্রথম জানতে পারলেন। বাবা সাধারণত রাত বারোটার আগে কখনো বাড়ি ফিরতেন না। সেদিন কি কারণে দশটার আগেই ফিরে এসেছিলেন। বাড়ি এসে যখন জানলেন যে টুর্নামেণ্টে ফাইন্যাল খেলায় খেলতে শিবপুর গিয়েছি তখনই বোধ হয় অনুমান করেছিলেন, ছেলে আজ তৈরী হয়েই বাড়ি ফিরবে। বৈঠকখানা ঘরে চুপচাপ বসেছিলেন আমারই অপেক্ষায়।'

শ্যামবাবু থামতেই ভোম্বলদা বললেন—'বোধ হয় খেলার রেজাল্ট জানবার আগ্রহেই বসেছিলেন!'

শ্যামবাবু একটুকরো আদা নুন মাখিয়ে মুখে দিলেন। গোঁপজোড়া একবার চুমড়ে নিয়ে বললেন—'টলতে টলতে দরজার চৌকাঠ পার হয়ে ভিতরের উঠোনে পা রাখা মাত্র বিরাশি সিক্কা ওজনের এক চড়। আমি হুমড়ি খেয়ে উঠোনে পড়ে গেলাম।

চুলের মুঠি ধরে আবার টেনে তুলে বাঁ হাতে বাঁ গালে আরেক চড়, ছিটকে পড়লাম দরজাটার উপর। মাথা ঠুকে গেল। মা ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন বলে সে-যাত্রা বেঁচে গেলাম। নইলে মারতে মারতে বোধ হয় আমাকে মেরেই ফেলতেন।'

ভোম্বলদা বললেন—'এই যে আপনি বললেন নেশা করার জন্যে আপনাকে প্রহার করেননি। তা হলে—'

শ্যামবাবু মুচকি হেসে বললেন—'কথাটা মিথ্যে বলিনি। আমাকে ও-ভাবে মারতে দেখে মা প্রতিবাদ করে বললেন—'যেমন বাপ তার ছেলেও তো তেমনিই হবে।'

প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বাবা বললেন—'তার মানে ? আমার কি কোনোদিন পা টলছে দেখেছো ? তোমার ছেলে কুলাঙ্গার, বংশের নাম ডোবাতে বসেছে।'

শ্যামবাবু গেলাসে আরেক চুমুক দিয়ে আদার কুচি মুখে ফেললেন। বললেন—'কিছু বুঝলেন ভায়া ?'

ভোম্বলদা নীরব।

'বুঝলেন না তো ? তা হলে শুনুন। বাবা রাগলে যেমন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন আবার রাগ পড়ে গেলেই শিবতুল্য মানুষ। চানটান করে খেয়ে উঠেছি, বাবা তখনো বৈঠকখানা ঘরে চুপ করে বসে। হঠাৎ মোলায়েম কণ্ঠে বললেন—শ্যাম, একবার এদিকে এসো। ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকেছি, পাশের চেয়ারে বসতে বললেন। তখন বাবা অন্য মানুষ। অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে বসে আছি। বাবার মুখেও কোনো কথা নেই। কিছুক্ষণ নীরবতার পর বাবা বললেন—খাও, আমি তাতে বাধা দেব না। কারণ, আমি নিজে যা করি অন্যকে তা না করবার উপদেশ দেওয়া আমার পক্ষে শোভা পায় না। তবে একটা কথা সব সময় মনে রেখো। মাতলামো করাটা আমি ঘৃণা করি, আর যতই খাও কোনোদিন পা যেন না টলে।'

শ্যামবাবু দশ আউন্সের বোতলের শেষটুকু আবার গেলাসে ঢাললেন, সোডার বোতলটায় হাত ছোঁয়ালেন না। চোঁ করে গেলাসটা নিঃশেষ করেই হাঁক দিলেন—'মোহন!'

কোথায় মোহন! একতলার টিনের শেড দেওয়া চত্বরটাতে তখন চেঁচামেচি, গালিগালাজ অজস্র বর্ষিত হচ্ছে। কে কার কথা শোনে। তারি মধ্যে ভেসে আসছে হেঁড়ে গলায় কাওয়ালি গান। মুখটা যতখানি সম্ভব বিকৃত করে শ্যামবাবু বললেন—'এই মাতালগুলোকে আমি সহ্য করতে পারি না। ঝগড়াঝাঁটি গালাগালি না করা পর্যন্ত এই সব পেঁচির দল মনে করে তাদের বুঝি নেশাই হল না।'

এতক্ষণে শ্যামবাবু ভোম্বলদার 'দাদা' হয়ে গিয়েছেন, ভোম্বলদা ছোটো ভাই।

শ্যামবাবু আবার বললেন—'বুঝলেন ব্রাদার, দো আই অ্যাম এ মাতাল, আই হেইট মাতালস্।'

ভোম্বলদা দুই চোখ বিস্ময়বিস্ফারিত করে বললেন—'সে কী দাদা, আপনাকে মাতাল বলবে কে। চোখের সামনে দেখছি পুরো বোতল নীট পার করে দিলেন, অথচ জিভের এতটুকু জড়তা পর্যন্ত নেই।'

শ্যামবাবু শ্বেতশুভ্র গোঁপজোড়া আরেকবার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনী দিয়ে চুমড়ে নিয়ে বললেন—'এটাও আমার সেই পিতৃদেবের শিক্ষা। সেই রাত্রির ঘটনা সব তো এখনো বলিনি, তবে শুনুন: বাবা আমাকে বললেন, ভাখ শ্যাম, দুটো কথা তোর কাছে আমার বলবার আছে। প্রথম কথা, মদের বোতল কি কখনো মাতাল হয়? হয় না। মদের বোতল কি কখনো টলে? টলে না। অথচ আকণ্ঠ মদ সেই বোতলে ভরা। সুতরাং যখনই নেশা করতে বসবি তখনই মনে মনে নিজেকে এই কথাই বোঝাবি যে, তুইও আকণ্ঠ মদভরা বোতল। বোতল

যেমন মাতাল হয় না, তুইও মাতাল হবি না। বোতল যেমন টলে না, তোরও কখনো পা টলবে না।'

এমন সময় মোহন একতলা থেকে ছুটতে ছুটতে এসেই হাঁক দিলে—'কার কি লাগবে তাড়াতাড়ি বলুন। নিচে হাজার ঝামেলা, আবার কখন উপরে আসতে পারব জানি না।'

শ্যামবাবুর দিকে তাকিয়েই মোহন বললে—'সে কি শ্যাম-বাবু, আপনার সোডার বোতল যেমন-কে-তেমন পড়ে আছে যে।'

শ্যামবাবু বললেন—'সেই জন্মেই তো তোকে খুঁজছি। সোডাটা তো নষ্ট করতে পারি না, নিয়ে আয় আর দশ আউন্স।'

পকেট থেকে টাকা বার করে মোহনের হাতে দিয়েই শ্যাম-বাবু বললেন,—'ভায়া যেন একটু হকচকিয়ে গেলে বলে মনে হচ্ছে। এটাও আমার বাবারই শিক্ষা। দ্বিতীয় যে কথাটা সেদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন আমার এই সত্তর বছর বয়েস পর্যন্ত সেই পিতৃবাক্য আমি লঙ্ঘন করিনি। তিনি বলেছিলেন —যখনই খাবি, মুখে ছোঁয়াবার আগে দু ফোঁটা মায়ের নামে উৎসর্গ করে খাবি। মনে মনে বলবি—মা, বিষটা তুমি নাও, অমৃতটুকু আমি পান করি। তাহলেই জানবি মা-ই তোকে রক্ষা করবেন।'

ভোম্বলদা বললেন—'আচ্ছা দাদা, দিনের পর দিন আপনি মাকে বিষ তুলে দিয়ে নিজে সুধা পান করছেন। কিন্তু একদিনও কি আপনার এ-কথা মনে হয়নি যে, সন্তান হয়ে মাকে বিষ খেতে বলাটা অপরাধ।'

ইতিমধ্যে মোহন ঝড়ের মতো এসে দুজনের সামনে দুটো বোতল রেখে ঝড়ের মতোই ছুটে চলে গেল। শ্যামবাবু গেলাসে খানিকটা ঢাললেন, সোডার বোতলে হাত ঠেকালেন না।

'কথাটা যা বলেছ ভায়া, লাখ টাকা দাম।' বলেই শ্যামবাবু গেলাসে চুমুক দিলেন।

'তবে কি জানো ভায়া, রামকৃষ্ণদেব গিরিশ ঘোষকে ঠিক এই উপদেশই দিয়েছিলেন। কিছুদিন বাদে গিরিশের মনে অনুশোচনা দেখা দিল—ছিঃ, কী স্বার্থপর আমি। মাকে রোজ বিষ খাওয়াচ্ছি। দিলে ছেড়ে মদ।'

ভোম্বলদা বললেন—'আচ্ছা দাদা, আপনার মনেও কি কোনো দিন এই অনুশোচনা দেখা দেয়নি?'

শ্যামবাবু বললেন—'রামপ্রসাদের সেই গানটা মনে আছে তো? সুরা পান করিনে আমি সুধা খাই জয় কালি ব'লে।'

সত্তর বছরের বৃদ্ধ শ্যামবাবুর গলায় রামপ্রসাদী সুরের টপ্পার কাজ নিখুঁত বেরিয়ে এলো। ভোম্বলদার চোখে মুখে বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

গানটা থামিয়েই শ্যামবাবু বললেন—'কথাটা হচ্ছে মদ-মাতালে আমাকে মাতাল বললেও মন-মাতাল হতে পারাটাই তো আমার কাম্য। তাছাড়া মা হচ্ছেন সর্বংসহা। সন্তানের সব অত্যাচার সহ্য করেন, আবার সন্তানকে রক্ষাও করেন তিনিই।'

এতক্ষণে ভোম্বলদা মনে মনে শ্যামবাবুকে গুরুর আসনে বসিয়ে দিয়ে নিজে প্রায় সাধনমার্গের তুরীয় অবস্থায় এসে একেবারে 'ভোম্' মেরে গিয়েছেন, আর আউন্স দশেক পেটে পড়লে 'না' অবস্থায় পৌঁছে চরম মোক্ষলাভ।'

নিচে একতলায় চেঁচামেচি আরও বেড়েছে, দোকানের ছোকরাগুলো তারস্বরে চীৎকার করে বলছে—'খেয়ে লেন, খেয়ে লেন, টাইম হয়ে এসেছে।'

হঠাৎ শ্যামবাবুর খেয়াল হল সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছে। নিচে যে রকম হট্টগোল শত ডাকলেও মোহনকে আর পাওয়া যাবে না। অথচ এই মুহূর্তে সিগারেট না হলেই নয়। ভোম্বলদারও ঐ একই অবস্থা, প্যাকেট অনেক আগেই নিঃশেষ।

শ্যামবাবু বললেন—'বুঝলে ব্রাদার, সিগারেট না হলে তো আর কথা জমবে না।'

ভোম্বলদাকে তখন শ্যামবাবুর কথার নেশায় পেয়ে বসেছে। ভোম্বলদা বললেন—'ঠিক বলেছেন দাদা, ধোঁয়া না হলে তো আর চলছে না। আমি নিজেই গিয়ে কিনে নিয়ে আসি।'

বাধা দিয়ে শ্যামবাবু বললেন—'না হে ব্রাদার, ও তোমার কম্মো নয়। তোমার অবস্থা যা দেখছি বেরোলে আর ফিরে আসতে পারবে না। তার চেয়ে তুমি বসো, আমিই যাই। উড়ে যাব আর উড়ে আসব।'

কথাটা বলেই শ্যামবাবু টেবিল ছেড়ে উঠে সামনের খোলা জানলাটায় শরীর গলিয়ে দুই হাত ডানার মতো বিস্তার করে উড়লেন।

বাইরের ফুটপাথে প্রচণ্ড আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচামেচি হৈ-চৈ, ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল।

পরদিন হাসপাতালের এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে মাথা মুখ হাত পা সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শ্যামবাবুর ছ'ফুট শরীর অসাড় হয়ে পড়ে আছে। তখনো জ্ঞান ফেরেনি। ভোম্বলদা একাগ্রচিত্তে বিমর্ষ হয়ে অপেক্ষা করছেন কখন জ্ঞান ফিরবে।

ঘণ্টা তিন সময় পার হবার পর শ্যামবাবুর জ্ঞান ফিরল, জ্ঞান ফেরা মাত্র প্রথম প্রশ্ন করলেন—'এখন কোথায় আছি।'

আশ্বস্ত হয়ে ভোম্বলদা বললেন—'হাসপাতালে আছেন। এখন ভালো বোধ করছেন তো দাদা ?'

শ্যামবাবুর দ্বিতীয় প্রশ্ন—'আমি হাসপাতালে কেন ?'

'আপনি জানলা দিয়ে উড়ে সিগারেট আনতে গিয়েছিলেন, সে-কথা আপনার মনে নেই ?'

'ও'—শ্যামবাবু নীরব। কিছুক্ষণ পর অনুশোচনার সুরে

শ্যামবাবু বললেন—'বুঝলে ভায়া, তোমার পাল্লায় পড়ে প্রথম আমি পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছি, তাই এই পদস্খলন। কিন্তু তুমি তো আমার সামনেই ছিলে, তুমি বাধা দিলে না কেন?'

কাতরকণ্ঠে ভোম্বলদা বললেন—'মতিভ্রম ছাড়া আর কি বলব বলুন, আপনার কথা শুনে আমিও বিশ্বাস করে বসেছিলাম যে, সত্যি সত্যিই আপনি পেরে যাবেন।'

সেদিন থেকে যতদিন বেঁচেছিলেন শ্যামবাবু আর মদ স্পর্শ করেননি, ভোম্বলদাও মনের মতো গুরু পেয়েও হেলায় হারালেন।

৪

শ্যামবাবুর মতো গুরু হাতের কাছে পেয়েও হারানোর কাহিনীটি বলেই ভোম্বলদা একটা সিগারেট ধরালেন।

আজ মাস-পয়লা, মাইনে পাবার দিন। ভোম্বলদা বেয়ারা কেষ্টাকে তাগাদা মেরে বললেন—'যা তো কেষ্টা, একবার ক্যাশিয়ার বাবুর কাছে যা। মাইনেটা কখন দেবে একবার জেনে আয়। আজ আবার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে, কথা দিয়ে এসেছি।'

কেষ্টা যাবার উদ্যোগ করতেই ভোম্বলদা আবার বললেন, 'আসবার সময় চার পেয়ালা চা নিয়ে আসিস। ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে বকর-বকর করে গলা শুকিয়ে গিয়েছে।'

কেষ্টা চলে যেতেই বাদল বললে, 'আচ্ছা ভোম্বলদা, যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলব?'

ভোম্বলদা সিগারেটটায় একটা জোর টান দিয়ে বললেন, 'বলতে তোদের সঙ্কোচটা কিসের আর বলতে কি তোরা কোনোদিন কসুর করেছিস?'

কিঞ্চিৎ সাহস পেয়ে বাদল বললে, 'আপনার মুখে শ্যামবাবুর ঘটনাটা শুনে রূপদর্শীর পরিচিত ব্রজদার কথা মনে পড়ে গেল। শুনেছি ব্রজদাকে "মাস্টার অব গুল" খেতাব দেবার জন্যে রাষ্ট্রপতির কাছে রেকমেণ্ডেশন গেছে। আমাদের ইচ্ছে, তার আগে আপনাকে আমরা ঐ খেতাবে ভূষিত করব।'

সঙ্গে সঙ্গে রাখাল আর ডেসপাচ ক্লার্ক নরেন হাত তুলে বললে, 'এ প্রস্তাবে আমরাও আমাদের পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি।'

ভোম্বলদা কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে বাদল রাখাল আর নরেনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হাতের সিগারেট হাতেই পুড়তে লাগল। অবশেষে মৌন ভঙ্গ করলেন ভোম্বলদা। ব্যথাতুর কণ্ঠে বললেন, 'ছি ছি ছি! মাছি-মারা কেরানির কাজ করতে করতে তোদের দেখছি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে। কার সঙ্গে কার তুলনা! ব্রজদা হচ্ছেন বাঙালীর গৌরব, রূপদর্শীর কল্যাণে আজ তিনি বাংলাদেশের যশোগাথা হয়ে বিরাজমান। তাছাড়া ব্রজদা ইজ টু গুড ফর দোজ খেতাবস্। ও-সব কাগজী সম্মান আর খেতাবের মুখে ব্রজদা ইয়ে করে দেন। দিতে হলে দেওয়া উচিত রূপদর্শীকে, যিনি ব্রজদাকে দেশবাসীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সেই কবে 'গুলবকাওলি" লেখা হয়েছিল তারপর এত বছর বাদে লেখা হল "ব্রজবুলি"। তোদের ঐ 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে আমার আপত্তি আছে। সেকুলর স্টেট-এ ও-উপাধি অচল। তবে তোদের এম্. জি. মাস্টার অব গুল-ও চলবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কোর্স-এ ওটা চালিয়ে দিতে পারিস। তার চেয়ে "গুল্মাবতার" উপাধিটাই সমীচীন বোধ হচ্ছে।'

ভুরু কুঁচকে বাদল বললে, 'গুল্মাবতার ভোম্বলদা। কথাটা যেন কেমন কেমন শোনাচ্ছে।'

ধমক দিয়ে ভোম্বলদা বললেন, 'আমার নামের সঙ্গে ওসব উপাধি কি মানায়? ওটা ব্রজদার জন্যেই তুলে রাখ। তবে শুনে রাখ, ব্রজদারও দাদা আছে, তার কথা তো তোরা কিছুই জানিস না।'

এমন সময় বেয়ারা কেষ্টা চার কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকেই বললে, 'ক্যাশিয়ার বাবু বললেন টিফিনের পরে মাইনে দেবেন।'

ভোম্বলদা কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হয়ে গেলেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'ভেবেছিলাম আজ একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরবো, তা আর হতে দেবে না দেখছি।'

বাদল উৎসাহিত হয়ে বললে, 'অত তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে কী করবেন। তার চেয়ে—'

'থাম থাম। ম্যালা ফ্যাচফ্যাচ করিসনে। বে-থা তো করলিনি, ও-সব কি বুঝবি।' ভোম্বলদা চায়ে চুমুক দিলেন, মুখে বিরক্তির ছাপ।

ডেসপাচ ক্লার্ক নরেন অনেক আগেই কলম গুটিয়ে ফেলেছে। ভোম্বলদার মুখে নতুন কিছু একটা ঘটনা শুনবার আশায় সে অনেকক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে ছিল। প্রসঙ্গটা ঘোরাবার জন্যে সে বললে, 'ব্রজদারও যে আবার দাদা থাকতে পারে এবং সে দাদা যে কী রকম দাদা, আমাদের তা কল্পনারও বাইরে।'

ভোম্বলদা বললেন, 'তোদের কল্পনার দৌড় তো আমার জানা আছে, তোদের এই ভোম্বলদা পর্যন্তই যায়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কে এনে দিয়েছে জানিস্?'

বাদল সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'সে আর কে না জানে। গান্ধীজী, জহরলাল নেহরু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র।'

ভোম্বলদা চায়ের কাপে শেষ চুমুক মেরে আবার একটা সিগারেট ধরালেন। ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ভোম্বলদা বললেন, 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামীদের কথাই তোরা জানিস। কিন্তু আরেকজন ভারতবাসী, যিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পরোক্ষ কারণ, তাঁর কথা তোরা কিছুই জানলি না, এর চেয়ে বড় দুঃখের কথা আর কি হতে পারে।'

ভোম্বলদার এই অভিযোগে সত্যিই লজ্জিত হয়ে পড়লো বাদল রাখাল আর ডেসপাচ ক্লার্ক নরেন।

ভোম্বলদা বললেন, 'এতে তোদের লজ্জিত হবার কারণ নেই। যার কথা বলছি তিনি আজ স্বনামধন্য ব্যক্তি এবং এরকম সার্থক-নামা লোক পৃথিবীতে কমই আছে। তাঁর পূর্বপরিচয় সকলেরই অজানা, তাই চট করে তাঁর নামটা মনে পড়বার কথা নয়।'

ভোম্বলদা দেয়াল-ঘড়িটার দিকে একবার তাকালেন। বেলা সাড়ে এগারোটা, টিফিনের এখনো অনেক দেরি, তারপরে মাইনে। সুতরাং—

ভোম্বলদা সেদিন যে কাহিনী বাদল রাখাল আর ডেসপাচ ক্লার্ক নরেনকে শোনালেন, তা আপনাদের কাছে বলা যাক।

ভোম্বলদা বললেন—জার্মান দেশ সম্বন্ধে একটা বহুল প্রচলিত প্রবাদ আছে যে, বার্লিনের রাস্তায় বেরিয়ে যদি তুমি একটা ঢিল ছোঁড়, হয় সেটা একটা ডগ-এর গায়ে লাগবে নয় তো একজন ডক্টরেটের।

আবার বিদেশীরা জার্মান দেশ সম্বন্ধে বলে—বার্লিনের রাস্তায় বেরিয়ে ইট ছুঁড়লেই ডকটরেট পাওয়া যায় অর্থাৎ গবেষণা করে একটি থান ইট ছাড়লেই সঙ্গে সঙ্গে ডকটরেট। তবে আজকাল তোদের কলকাতার অবস্থা যা হয়েছে বার্লিনকেও হার মানায়। প্রতিবছর গণ্ডায় গণ্ডায় ডকটর বেরোচ্ছে, তার ফলে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারে একাকার হয়ে কে যে কী, তা আর বোঝার উপায় নেই। কলকাতার রাস্তার কুকুরগুলোকে না ধরে যদি এই ডক্টরগুলোকে ধরতো তাহলে বাংলাদেশের ছাত্রদের কল্যাণ হত।

আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন ডক্টরেটের এত ছড়াছড়ি ছিল না, আর তখনকার আমলে ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট এত সহজলভ্য ছিল না।

সেই যুগের ভারতবর্ষেরই এক কৃতী সন্তান বহু পরিশ্রম করে বহু গবেষণার পর এক থীসিস্ তৈরী করলেন ডক্টরেটের জন্যে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে একের পর এক ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তাঁর থীসিস্ সাবমিট করলেন, প্রত্যেকেই তা ফেরত পাঠালে। তাদের বক্তব্য, যে বিষয় নিয়ে এই থীসিস্, সে বিষয়টিকে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার বিষয়রূপে

মর্যাদা দিতে অপারগ। অতএব দুঃখের সঙ্গেই তা নাকচ করা হল।

বিষয়টা ছিল একটু স্বতন্ত্র জাতের। অশোকের শিলালিপি, রবীন্দ্রকাব্যে সীমা ও অসীম বা প্রাচীন ভারতে শক্তিপূজা এইসব মামুলি বিষয় নয়। ভদ্রলোকের থীসিসের বিষয় ছিল গুল। যে বিষয়ের পারঙ্গমতার জন্য ব্রজদাকে তোরা উপাধি দিতে চাস কিংবা আমাকে ডিগ্রী।

ইতিপূর্বে গুল নিয়ে কোনো গবেষণা হয়নি। ভদ্রলোক পৃথিবীর সব দেশের প্রাচীন ও আধুনিককালের গুলসম্পর্কিত তথ্য ও উদাহরণ সংগ্রহ করে তার উপর ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনামূলক গবেষণা করেছিলেন, খুবই মূল্যবান গবেষণা।

কিন্তু তোরা তো জানিস, গুণীর আদর আমাদের দেশে অত সহজে হয় না।

বিদেশের লোক বাহবা না দিলে আমরা কখনো তার গুণ স্বীকার করি না। বেদ উপনিষদ বিদেশী পণ্ডিতদ্বারা গ্রন্থাকারে অনুবাদ না বেরলে আমাদের ধর্মের আকর গ্রন্থ দুটির কোনো মর্যাদাই আমরা দিতাম না। জার্মান মনীষী গ্যয়টে শকুন্তলা কাব্যকে মহৎ সৃষ্টি বলেছিলেন বলেই কালিদাসকে আজ আমরা মাথায় তুলে রেখেছি। নোবেল প্রাইজ না পেলে রবীন্দ্রনাথকে কি কেউ পাত্তা দিত? স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোয় বিশ্বধর্ম-সম্মেলনে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দিয়ে মার্কিন মুলুককে সম্মোহিত করেছিলেন বলেই দেশে ফিরে আসার পর তাঁকে আমরা গুরুর আসনে বসিয়েছি। এরকম কত উদাহরণ চাস।

গুল সম্পর্কে গবেষক এই ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিটির কপালে সেই একই লাঞ্ছনা জুটেছিল। ভারতের সব বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রত্যাখ্যান করল তখন দুঃখে ক্ষোভে হতাশায় ভদ্রলোক একদিন রাত্রে পেট্রোল ঢেলে তাঁর থীসিসের পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলাই স্থির করলেন।

কিন্তু নিজের সৃষ্টিকে বিনষ্ট করা আপন হাতে নিজ সন্তানকে হত্যা করার সামিল। এই অপরাধ করার পূর্বে কন্যাকুমারিকার মন্দিরে গিয়ে প্রথমে পূজো দিলেন, তারপর কেপ-কমোরিনে ভারতমহাসমুদ্রের কোলে সূর্যাস্ত দেখার বাসনায় শিলাখণ্ডের উপর ধ্যানস্থ হয়ে বসলেন। বিষণ্ন সন্ধ্যার করুণ আভা ছড়িয়ে পশ্চিম সমুদ্রে সূর্য অস্ত গেল। চারিদিকে আঁধার নেমে এসেছে, শিলাখণ্ডের উপর সমুদ্রতরঙ্গের মুহুর্মুহু আঘাত যেন বার বার করে তাকে বলছে—'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনোখানে।'

সহসা ভদ্রলোকের অন্তরে এক গভীর উপলব্ধি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সত্যিই তো, তাঁর দীর্ঘ বৎসরের কঠোর পরিশ্রমের ফল এ ভাবে বিনষ্ট করা উচিত নয়। এ-দেশে যদি না হয়, অন্য কোথা অন্য কোনো দেশে চেষ্টা করে ছাখো!

বাড়ি ফিরে এসে গবেষণার পাণ্ডুলিপি আপন সন্তানের মতো বুকে জড়িয়ে ধরে সমস্ত রাত জেগে বসে রইলেন, দুই চোখে অবিরাম জলধারা।

পরদিন সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে বিগত রাত্রির সব গ্লানি মন থেকে ধুয়েমুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। উনি জানতেন যে, ফরাসীদেশ ছিল ইউরোপের সংস্কৃতির কেন্দ্র, সে-দেশে সম্মান-লাভ করলে সঙ্গে সঙ্গে তা সমগ্র ইউরোপে আলোর মতো ছড়িয়ে পড়বে। সেইদিনই তিনি ফ্রান্সের সরবর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর থীসিস্ পাঠিয়ে দিলেন ডক্টরেটের আবেদনপত্র সমেত।

মাস ছয় বাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর এক পত্রে জানালেন তাঁর থীসিস্ গৃহীত হয়েছে, তিনজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের কাছে তা পরীক্ষায় পাঠানো হল।

এই চিঠির পর একটা মাসও পার হয়নি, হঠাৎ এক কেব্‌ল এসে হাজির, অবিলম্বে তাঁকে প্যারিসে উপস্থিত হতে হবে।

পরের মাসেই প্যারিসে গিয়ে হাজির, আর হাজির হওয়া মাত্র তাঁকে নিয়ে লোফালুফি শুরু হয়ে গেল। ইউনিভার্সিটি হল-এ বিরাট সংবর্ধনা। ডীন অব ফ্যাকালটিজরা উপস্থিত, প্রফেসর রীডার লেকচারার সবাই। ফরাসীদেশের সেরা পণ্ডিতদের উপস্থিতিতে তাঁকে ডকটরেট দেওয়া হল এবং তাঁর সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে উঠে পণ্ডিতরা একবাক্যে বললেন যে, এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্যসমৃদ্ধ মৌলিক গবেষণা এর আগে আর কোনো ভারতবাসীর কাছ থেকে তাঁরা পাননি।

ফরাসী সরকারের প্রেসিডেন্ট ছিলেন সেই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সভাপতি। সভাপতির ভাষণে তিনি ফরাসীদেশের পক্ষ থেকে ঘোষণা করলেন যে, এই ভারতীয় পণ্ডিতকে তাঁর মহামূল্যবান গবেষণা কার্যের জন্য সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করে আমি ও আমার দেশ ধন্য হতে চাই, এখন থেকে তাঁর উপাধি হল "মঁশিয়ে গুল-ফ্রাঁসে"।

সঙ্গে সঙ্গে সে-দেশের সংবাদপত্রের যত রিপোর্টার আর প্রেস ফটোগ্রাফার ছেঁকে ধরল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, ছবির পর ছবি। পরদিন সকালে ফরাসীদেশের সব কয়টি দৈনিক কাগজে তাঁর ছবি লাইফস্কেচ এবং তাঁর থীসিসের বিষয়বস্তু নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা।

রাতারাতি সেই ভারতীয় ভদ্রলোক সারা ইউরোপে বিখ্যাত হয়ে গেলেন। ইউরোপের একটা মস্ত গুণ হচ্ছে যে, পণ্ডিত, শিল্পী, সাহিত্যিক, গায়ক, নর্তকী প্রভৃতিকে নিয়ে মাতামাতি করতে এরা ভালবাসে। তাছাড়া এ নিয়ে ইউরোপে রেষারেষিও আছে খুব। সংস্কৃতির সমঝদারিতে এক দেশ আরেক দেশের তুলনায় পিছিয়ে থাকবে, তা কখনই হতে দেবে না। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে সেই ভারতীয় ডক্টর মঁশিয়ে গুল-ফ্রাঁসের আমন্ত্রণ এল ইটালীর রোম নগরীতে।

সেখানেও বিরাট সংবর্ধনা, সেই সঙ্গে তাঁকে রাষ্ট্রীয় উপাধি দেওয়া হল "সিনর গুলোনিনি"।

ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ডক্টরেট সিনর গুলোনিনি এবার আমন্ত্রণ পেলেন জার্মানীর কাছ থেকে। বার্লিনে রাইখস্টা-গের বিরাট সুউচ্চ বক্তৃতামঞ্চে তুলে সে-দেশের চ্যান্সেলার বললেন যে, জার্মান জাতি এমন একজন গুণী ভারতীয়কে সর্বপ্রথম ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গভীরভাবে দুঃখিত। তথাপি আজকের এই মহতী জনসভায় বেদ ও উপনিষদ, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের দেশ থেকে আগত এই মহাজ্ঞানী পণ্ডিতকে জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করা হল, ইনি আজ হলেন—"হের ফন গুলেন্‌বের্গ"।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ বিদীর্ণ করে অগণিত জনতা তিনবার সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি তুললেন—হাইল ইণ্ডিস্কি, হাইল ডয়েশল্যাণ্ড, হাইল গুলেনবের্গ।

জার্মানীর পরেই এবার তাঁকে যেতে হল সোভিয়েট রাশিয়ায়, মস্কোর রেডস্কোয়ারে তাঁর বিপুল সংবর্ধনা। ওদেশে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের সংবর্ধনা নাকি মাঠে-ময়দানে না করে উপায় নেই। জনতার চাপ এত বেশি যে, কোনো প্রশস্ত হলঘরে স্থান সংকুলান সম্ভব হয় না। ওদেশের জনতা শুধু কবির দর্শন লাভে বা আবৃত্তি শুনে সন্তুষ্ট নয়, তার কোটপ্যাণ্ট জুতো মোজা খুলে না নেওয়া পর্যন্ত জনতার ভক্তি-শ্রদ্ধার পুরো নিদর্শন নাকি দেখানো হয় না। সেই কারণে নিজেদের দেশের কোনো শিল্পীকে তারা রেডস্কোয়ারে ছাড়া অন্যত্র কোথাও সংবর্ধনা দেয় না, ভারতীয় হলে তো কথাই নেই।

সেই রেডস্কোয়ারেই ভারতীয় ডক্টরের সংবর্ধনা। লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ, শুধু মাথার পর মাথা, তোড়ার পর তোড়া

ফুল। মহামান্য স্তালিন ভারতীয় গুণীকে নিয়ে রোস্ট্রামে আরোহণ করা মাত্র সমবেত জনতার শত লক্ষ কণ্ঠ ধ্বনি তুলল—হো হো হো। স্তালিন ডান হাতে ভারতীয় ভদ্রলোকের বাম হস্তের কব্জি শূন্যে তুলে ধরে বললেন—সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রথা অনুসারে আমরা এই ভারতীয় গুণীকে যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে নূতন নামে অভিষিক্ত করতে চাই। আজ থেকে তাঁর উপাধি হল—কমরেড গুলেন্‌কভ।

সঙ্গে সঙ্গে রেডস্কোয়ারের আকাশ বাতাস মুখরিত করে লক্ষ লক্ষ জনতা তিনবার ফুলের তোড়াসমেত হাত শূন্যে নিক্ষেপ করে ধ্বনি তুলল—হো হো হো।

সভা ভঙ্গ হওয়ামাত্র সেই বিপুল জনতা আগে কেবা ফুল করিবেক দান তারি লাগি কমরেড গুলেন্‌কভের দিকে ধাওয়া করল। এবার বুঝি প্যান্ট কোট খুলে নিয়ে যায়। কিন্তু ভারতীয় অতিথি, তাই পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে এগিয়ে আসা সম্ভব হল না। পুলিশ বেধড়ক বেটন চালালে, কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে, কত লোকের মাথা হল ফাটা।

মস্কো সংবর্ধনার সচিত্র সংবাদ প্রাভদা আর ইজ্‌ভেস্তিয়ায় ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ পার্লামেন্টের টনক নড়ল। কে এই ভারতীয়, যাকে নিয়ে সারা ইউরোপ এত সোরগোল তুলেছে! এমন কি সোভিয়েট রাশিয়া পর্যন্ত।

লেবার পার্টির ক্লিমেন্স এট্‌লি তখন প্রাইম মিনিস্টার। জরুরী কেবিনেট মিটিং ডাকলেন। সদস্যদেব বুঝিয়ে বললেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের এক ভারতীয় প্রজাকে নিয়ে সারা ইউরোপের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি যে-ভাবে সম্মান জানাচ্ছে তাতে ভারতবর্ষকে তো আর পরাধীন রাখা চলে না। এতে বৃটিশ সরকারের প্রেস্টিজ অ্যাট স্টেক। রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ করে একবার আমেরিকার লোকেরা বলেছিল—you are the reason why India

should be free। এঁকে নিয়েও আবার তারা সেই একই স্লোগান তুলবে। তারা বলবে, যে-দেশে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, নেহরু আর ডক্টর গুলফ্রাঁসের মত মনীষী জন্মায় এবং যে-দেশের এই সব মানুষকে নিয়ে সারা পৃথিবী এত সম্মান দেখায়, সেই ভারতবর্ষের মত সভ্যদেশকে পরাধীন রাখা বৃটিশ গবর্নমেণ্টের পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়।

ক্যাবিনেটের সদস্যরা একবাক্যে প্রধানমন্ত্রী এট্‌লিকে সমর্থন জানিয়ে বললেন—হক কথা। ভারতবর্ষের মত সভ্যদেশকে বৃটিশ সরকারের পদানত রাখলে বিশ্বের কাছে বৃটিশ সরকারের মান মর্যাদা গৌরব কিছুই বাড়বে না, পরন্তু হেয় প্রতিপন্ন হতে হবে। ক্যাবিনেটে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। এট্‌লি সঙ্গে সঙ্গে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতে পাঠিয়ে রাতারাতি ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা পাইয়ে দিলেন।

এদিকে সেই ভারতীয় ডক্টরেট তখন চীনদেশে গিয়ে উপস্থিত। তখনো মাও সে-তুং-এর রাজত্ব আসেনি, কুয়োমিনটাং-এর রাজত্ব। চিয়াং-কাই-শেকের আমন্ত্রণে সে-দেশে যাওয়া মাত্র চীন সেই ভারতীয় গুণীকে উপাধি দিলেন—গুলিয়াৎসেন। চীন-দেশের মহান নেতা সানিয়াৎসেন নামের ঐতিহ্যবাহী এই পদবী তৎকালীন চীনের শ্রেষ্ঠ সম্মান।

স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু তখন ভারতবর্ষের নন-অ্যালাইনমেণ্ট নীতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন এবং লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসের হর্তা-কর্তা কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে গভীর রাত্রে টেলিফোনযোগে গোপন শলা-পরামর্শ চলছে।

আসল খবরটা জানিয়ে দিল কৃষ্ণ মেনন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির গোপন খবর। সেই সঙ্গে কৃষ্ণ মেনন নেহরুকে এটাও জানালেন যে, অবিলম্বে সেই ভারতবাসী ডক্টরকে দেশে

ফিরিয়ে এনে যথাযোগ্য সংবর্ধনা আর সম্মান না দিলে স্বাধীন ভারতের মুখে চুনকালি পড়বে।

নেহরু চমকে উঠলেন। তাই তো! বিদেশে কে এক ভারতীয় ডক্টরকে নিয়ে খুব হৈ-চৈ হচ্ছে এখবরটা তিনিও যেন বিদেশী কাগজে দেখেছেন বলে মনে হচ্ছে! সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ল তাঁর ভারতবর্ষে। একযোগে ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান-মন্ত্রীর আমন্ত্রণ।

ডক্টর গুলিয়াংসেন তখন চীন থেকে জাপানে গিয়ে উপস্থিত। টোকিও শহরে রাজা হিরোহিতোর প্রাসাদে তখন বিরাট ভোজসভা।

জাপানের পক্ষ থেকে তাঁকে উপাধি দেওয়া হল ডক্টর গুলে-কাওয়া। ভোজনপর্ব সমাধার পর নানা বর্ণের বসন ভূষণে সজ্জিতা জাপানী সুন্দরী গেইশারা নাচের আসরে আবির্ভূতা হয়েছেন এমন সময় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এসে জাপানী প্রথায় কাওটাও করে ডক্টর গুলেকাওয়ার হাতে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি আর প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন ও আমন্ত্রণ লিপি দিলেন। চিঠি পেয়ে ভারতীয় ডক্টর অভিভূত হয়ে গেলেন। এতদিন পরে দেশ তাঁকে স্মরণ করল! কিন্তু তখনও তাঁর কাছে আরো অনেকগুলি দেশের নিমন্ত্রণ এসেছে এবং তিনি তা গ্রহণও করেছেন। জানিয়ে দিলেন যে, নিজের দেশ তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছে এব চেয়ে আনন্দ আর গৌরবের বিষয় আর কী হতে পারে। তবে দেশে ফেরার আগে তিব্বত, পাকিস্তান ও ইরান হয়ে ভারতে ফিরবেন, সুতরাং আরো মাসখানেক সময় নেবে।

জাপান থেকে প্রথমে গেলেন তিব্বতে। পাঞ্চেন লামার দরবারে তিব্বতের তাবৎ পণ্ডিতের সমাবেশ। চায়ের বাটিতে মাখনের ড্যালা ফেলে তাঁকে আপ্যায়িত করে উপাধি দেওয়া হল গুল্‌চেন্‌ লামা।

সেখান থেকে চলে এলেন পাকিস্তানে। করাচীর সমুদ্রোপকূলে পাকিস্তানের কবিকুল অনেক গজল আর শায়ের শোনালেন তাঁকে বরেণ্য অতিথির সম্মান দিয়ে। সেই সঙ্গে সে-দেশে তাঁর উপাধি হল—গুল্ মহম্মদ।

এবার যেতে হল গোলাপ আর বুলবুলের দেশ ইরানে। গোলাপ ফুলে সজ্জিত মঞ্চে বসিয়ে তাঁকে খেতাব দেওয়া হল গুলেন শাহ্।

এতদিন পর বহু দেশ ঘুরে রাজকীয় সম্মানে ভূষিত হয়ে তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পালা। ভারতের সবগুলি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় দিন গুণছে। সবাই প্রস্তুত হয়ে আছে তাঁকে 'ডক্টর অনরিয়াস কজা' দেবার জন্য।

ভারতবর্ষে ফিরেই তিনি প্রথমেই চলে গেলেন কন্যাকুমারীর মন্দিরে। জগৎজোড়া সাফল্যের জন্য পূজা দিলেন, কেপ-কমোরিনের সেই শিলাখণ্ডের উপর বসে ধ্যানসমাহিত চিত্তে ভারতের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার সংকল্প নিলেন।

তারপর গেলেন মাদ্রাজে। মাদ্রাজবাসী তাঁকে পেয়ে ধন্য হল। টাউন হলে বিরাট সংবর্ধনা সভায় সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁকে 'অবিনাশী গুললিঙ্গম্' উপাধিতে ভূষিত করে বললেন—আপনি অগাধ গুণসম্পন্নই শুধু নহেন, অপার গুলসমুদ্রে আপনি নির্ভীক নাবিক। আপনাকে দেখিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

মাদ্রাজের পাট চুকিয়ে তাঁকে যেতে হল রবীন্দ্রনাথের পীঠস্থান বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। আম্রকুঞ্জে সম্বর্ধনার আয়োজন, মন্দিরাসহ আশ্রম-বালিকারা তিন পা-এগোনো দুপা-পিছানো মণিপুরী নৃত্যে স্বাগত জানালেন এবং উপাচার্য ছাতিম গাছের পাতা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে উপাধি দিলেন—গুলিকোত্তম্।

এদিকে দিল্লীর দরবারে তখন সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। রাষ্ট্রপতি ভবন সংলগ্ন মোগল উদ্যানে সংবর্ধনার বিরাট আয়োজন।

ভি-আই-পিরা সস্ত্রীক ও সবান্ধবী আমন্ত্রিত, মোগল উদ্যানে প্রজাপতির হাট। দিল্লীতে যতগুলি আকাদমী আছে সবগুলির পক্ষ থেকে তাঁকে মানপত্র দেওয়া হল এবং সেই সঙ্গে উপাধি দেওয়া হল—গুল্মবিভূষণ।

শুধু সংবর্ধনা আর উপাধি দিলেই তো হবে না, জগৎবরেণ্য এই মহামনীষীকে ভারতবর্ষের কোথাও গুরুত্বপূর্ণ কাজে আটকে রাখা প্রয়োজন।

সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবিনেট মিটিং বসে গেল এবং সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল, লোকসভার উপনির্বাচনে হায়দ্রাবাদের গুলবার্গা থেকে দাঁড় করিয়ে সরাসরি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বে তাঁকে বহাল করা হবে।

ভোম্বলদা থামলেন। পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরালেন। দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকালেন, দেড়টা বেজেছে। টিফিন পিরিয়ড শেষ, ক্যাশিয়ারবাবুর ডাক আসেনি।

অধৈর্য হয়ে ভোম্বলদা ঘন ঘন সিগারেটে টান দিচ্ছেন আর পা নাচাচ্ছেন!

ওদিকে বাদল রাখাল আর ডেস্‌পাচ ক্লার্ক নরেন এতবড় একটা কাহিনী শুনে ভ্যাবাচাকা মেরে গিয়েছে। স্বনামধন্য ব্যক্তিটির নাম একবারও ভোম্বলদা উচ্চারণ করেননি অথচ নামটি জানবার আগ্রহে অধীর অপেক্ষায় তারা ভোম্বলদার মুখের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে।

ওদের উৎকণ্ঠায় ফেলে রেখে ভোম্বলদা নির্বিকার। পা নাচাচ্ছেন আর সিগারেট টানছেন, ধোঁয়া ছাড়ছেন আর পা নাচাচ্ছেন। অবশেষে ভোম্বলদাই মুখ খুললেন, বললেন, 'এই ভারতীয় ডক্টরটি কে, কিছু বুঝতে পারলি ?'

বাদল বললে, 'না ভোম্বলদা, কিছুই তো বুঝতে পারলাম না।'

ভোম্বলদার ঠোঁটে আবার সেই বাঁকা হাসি। বললেন,

'কেরানীর কাজ করে করে মাথাটা তো গোবরের সার করে বসে আছিস। বুঝবি কি করে।'

উৎকণ্ঠা চেপে রাখতে না পেরে ডেসপাচ্ ক্লার্ক নরেন বললে, 'নামটা বলেই ফেলুন না দাদা, কেন আর আমাদের নিয়ে খেলাচ্ছেন।'

গম্ভীর গলায় ভোম্বলদা বললেন, 'তবে শোন। ওঁর নাম ডক্টর গুল্‌জারিলাল নন্দা।'

'অ্যাঁ!' তিনজনেই একসঙ্গে আঁৎকে উঠলো।

ভোম্বলদা আবার বললেন, 'থীসিসটা কী নামে বই আকারে ছাপা হয়েছে জানিস?'

'না তো',—তিনজনে একসঙ্গেই বলে উঠল।

ভোম্বলদা আবার ধমকের সুরে বলে উঠলেন, 'কিছুই তো জানিস না। ওদিকে স্বাধীন ভারতের নাগরিক বলে গর্ব করিস। চাকরির উন্নতি তোদের কোনোকালেই হবে না। ইণ্টারভিউ হলে ভাইভাভোসিতেই গোল্লা। জেনে রাখ, ভবিষ্যতে কাজ দেবে। থীসিসটার নাম, 'ভারতবর্ষের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।'

এবার বাদল রাখাল এবং ডেসপাচ ক্লার্ক নরেনের মুখে আর রা নেই।

বেয়ারা কেষ্টা এসে খবর দিলে, ক্যাশিয়ারবাবু ডাকছেন মাইনে নেবার জন্যে।

সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন ভোম্বলদা।

বাদল হঠাৎ বলে উঠল, 'ভোম্বলদা, আমরা মত পরিবর্তন করলাম। 'গুল্মাবতার' উপাধিটা ব্রজদাকে না দিয়ে আপনাকেই আমরা দেব।'

ঘর থেকে চৌকাঠ পার হয়ে করিডরে পা দিয়ে ভোম্বলদা বললেন, 'তোদের যা-ইচ্ছে তোরা কর। আমার এখন কথা বলবার সময় নেই।'

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ ভোম্বলদা আবার ফিরে এসে ইস্কুলমাস্টারের মত প্রশ্ন করলেন, 'ঈশবস্ ফেবল্স-এর বাংলা কী হবে বলতে পারিস ?'

বাদল সপ্রতিভ হয়ে বললে, 'এ আর শক্ত কি, ঈশপের গল্প, ছেলেবেলায় আমরা পড়েছি।'

ভোম্বলদা খেঁকিয়ে উঠে বললেন, 'এই বিদ্যে নিয়ে জন্মেছিস বলেই তো তোদের এই হাল। ও কথাটার বাংলা তর্জমা হবে 'ঈশব গুল।' তোদের শিক্ষা অধিকর্তা শুনছি ইংরিজি কথার বাংলা পরিভাষা তৈরীর জন্য কমিটি বসিয়েছে, সেখানে পাঠিয়ে দিস। সরকারী কেরানীদের পরিভাষা পাঠ্য পুস্তকে চালিয়ে দিতে পারবে।'

ভোম্বলদা আর দাঁড়ালেন না। করিডর ধরে তাঁর দ্রুত পদধ্বনি মিলিয়ে গেল।

৫

ক্যাশিয়ারবাবুর কাছ থেকে মাইনে নিয়েই ভোম্বলদা আবার কী মনে করে ফিরে এলেন নিজের ঘরে।

বাদল রাখাল আর ডেস্‌পাচ ক্লার্ক নরেন তখন সবে আরেক বাউণ্ড চা আনিয়ে গুলতানি করছে, তাদের আলোচনার বিষয় ছিল ভোম্বলদার গুল, যার জন্যে আজকের টিফিনের ছুটিটাই ওদের মারা গেল।

হঠাৎ ভোম্বলদাকে ফিরে আসতে দেখে ওরা তিনজনেই চুপ মেরে গেল। ওদের মনে তখন একমাত্র আশঙ্কা এই যে, ভোম্বলদা যখন বাড়ি না গিয়ে আবার ফিরে এসেছেন তখন আবার একটা গল্প ফেঁদে বসবেন। আর যদি তাই হয়, তা হলে তো সেদিনের মত কাজের দফা গয়া।

ভোম্বলদা কিন্তু সেইদিকেই গেলেন না। এমন কি জমিয়ে গল্প বলতে হলে নিজের চেয়ারে জম্পেশ হয়ে বসা প্রয়োজন, সেদিকেও তাঁর কোনো উৎসাহ নেই।

একটা উদাসীন ভাব নিয়ে ভোম্বলদা পকেট থেকে কুড়িটা টাকা বাদলের দিকে এগিয়ে ধরে বললেন—'এই নে বাদল, তোর সেই কুড়ি টাকা। খুচরো-খাচরা আরো দু-চার টাকা যা তোর কাছ থেকে নিয়েছি তা আর শোধ করতে চাইনে। সব ঋণ একেবারে শোধ করে দিলে ভোম্বলদাকে হয়তো তোরা ভুলেই যাবি।'

বেশ কিছুটা অবাক ও অপ্রস্তুত হয়ে বাদল বললে—'সে কী ভোম্বলদা, টাকাটা আজই ফেরত দেবার জন্য এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন!'

ভোম্বলদা মৃদু হেসে বললেন—'ভবিষ্যতের পথ খোলসা রাখবার জন্যেই টাকটা ফেরত দিলাম। আবার প্রয়োজন হলে চাইব কোন লজ্জায়।'

নেশার প্রয়োজনে টাকা ধার চাওয়া ভোম্বলদার জন্মগত অধিকার, বাদল রাখাল আর ডেসপাচ ক্লার্ক নরেন তা জানত। ধার নিয়েই ভোম্বলদা একগাল হেসে বশংবদ হয়ে বলতেন—'বাঁচালি ভাই, তোরা আমাকে চিরঋণী করে রাখলি।' এবং ভোম্বলদার আর সব কথা এন্তের মিথ্যে হলেও এই একটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য—তা একাধিকবার একাধিক জনের কাছে প্রমাণিত হয়েছে।

টাকাটা বাদলের হাতে গুঁজে দিয়েই ভোম্বলদা যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

বাদল বললে—'ভোম্বলদা আজ হঠাৎ এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন?'

ভোম্বলদা সলজ্জ হেসে বললেন—'তোদের বৌদির কাছে কথা দিয়ে এসেছি যে, মাইনে পেয়েই সকলের ধার দেনা শোধ করে সোজা বাড়ি গিয়ে বাকি টাকাটা ওর হাতে তুলে দেব।'

ডেসপাচ ক্লার্ক নরেন বরাবরই একটু ঠোঁট-কাটা। দুম্ করে বলে বসলো—'যাক, এতদিনে ভোম্বলদার শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে।'

অন্যদিন হলে নরেনের কথায় ভোম্বলদা ফোঁস করে উঠতেন। আজ কেমন যেন একটা নির্লিপ্ত ভাব। কোনো উষ্মা প্রকাশ না করে শুধু বললেন—'শুভবুদ্ধি কি সাধে হয়েছে, গুঁতোর চোটে হয়েছে।'

গুঁতোটা যে কোত্থেকে কি ভাবে এসেছে তা বাদল রাখাল আর ডেসপাচ ক্লার্ক নরেন শুনেছিল। শুনেছিল শালুকের সেই মুরারীর কাছেই। নেশা করে ভোম্বলদা নিত্যি টাকা ওড়াচ্ছেন আর ওদিকে ভোম্বলদার স্ত্রী সারা মাস পাড়াপড়শীদের কাছে

চাল ডাল তেল নুন এমন কি আলু বেগুন ধার করে দু বেলা উদরান্নের ব্যবস্থা করেন। শত অভিযোগেও ভোম্বলদার সে-বিষয়ে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। পাড়ার লোকেরা বিরক্ত, ওদিকে পাড়ার ক্লাব 'শক্তি সঙ্ঘ'র ছেলেরা মুখিয়ে আছে ভোম্বলদাকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্যে।

তারা জানতো আজ ভোম্বলদার মাইনে পাবার দিন। আপিসে বেরোবার সময় বড় রাস্তার মোড়েই শক্তি সঙ্ঘের আস্তিন গোটানো হুদো-হুদো ছেলেরা ভোম্বলদাকে ঘিরে ধরলে। তারা শাসিয়ে দিলে যে, আজ মাইনে নিয়ে বাসি মুখে সোজা বাড়ি এসে বৌদির হাতে সব টাকা তুলে দিতে হবে। ব্যতিক্রম হলে রক্ষা নেই।

আজ আপিসে এসেই মুরারী এই সব খবর দিয়ে রেখেছিল বাদল রাখাল আর নরেনের কাছে। ভোম্বলদার মুখে গুঁতোর কথা শুনেও ওরা চুপ করে রইল, কোনো মন্তব্য করল না।

ভোম্বলদা বললেন—'জানিস, আজ আপিসে আসবার সময় বাস্‌টা যখন ঠিক মাঝ গঙ্গায় এসেছে তখন মনে মনে মা গঙ্গার কাছে এই বলে মানত করলুম, মা গঙ্গা, আজ যদি ভালোয় ভালোয় তোমার বুকের উপর দিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে পারি তাহলে তোমার কোলে পাঁচ টাকা সোয়া পাঁচ আনা বিসর্জন দিয়ে তোমার আশীর্বাদ চাইবো যেন আজ থেকে কোনো পাপ আমাকে স্পর্শ না করে।'

ভোম্বলদা শান্ত গম্ভীর গলায় কথাগুলি এমনভাবে বললেন, যেন একটা কঠিন সংকল্পবাক্য অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত নির্গত হল।

ভোম্বলদা আর অপেক্ষা করলেন না। বললেন—'যাই, দারোয়ান অনেকগুলো টাকা পাবে, পানওয়ালাও। ওদের দেনাটা চুকিয়ে দিতে পারলে আমি প্রায় মুক্ত পুরুষ।'

ভোম্বলদা চলে গেলেন। যাবার আগে শুধু বলে গেলেন—'কাল থেকে দেখিস, তোদের ভোম্বলদা অন্য মানুষ।'

দারোয়ান আর পানের দোকানে পুরো পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে যখন রাস্তায় বেরোলেন তখন তাঁর পকেটে অবশিষ্ট আছে আর মাত্র ত্রিশটা টাকা। মনকে দৃঢ় করে ভোম্বলদা চলেছেন হাওড়া পুলের দিকে, কোনোরকমে শাল্‌কে পৌঁছে স্ত্রীর হাতে টাকাটা তুলে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত।

একাগ্রচিত্তে চলেছেন ভোম্বলদা। কোনো দিকে তাকানো নয়, পাছে প্রলোভন এসে মনকে দুর্বল করে দেয়। কাতারে কাতারে লোক চলেছে রাস্তা দিয়ে, কারো মুখের দিকে তাকানো নয় পাছে হাতছানি দেয় পথভ্রষ্ট হবার।

ফুটপাথের উপর নির্দিষ্ট দৃষ্টি মেলে ভোম্বলদা চলেছেন—এবং যেতে যেতে মনকে এই বলে প্রবোধ দিচ্ছেন :

'মন, তুমি সংকল্পে অবিচলিত থেকো। মদ মোহ মাৎসর্যকে জয় করা চাই, কোনো প্রলোভনেই তুমি দুর্বল হয়ো না।'

ভোম্বলদা হন্ হন্ করে চলেছেন, যেন গন্তব্যস্থলে পৌঁছনো ছাড়া তাঁর সেই চলার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

কখন যে স্ট্র্যাণ্ড রোড হ্যারিসন রোডের মোড়ে এসে গিয়েছেন সে খেয়াল ছিল না ভোম্বলদার। সামনেই হাওড়ার পুল। মাঝ গঙ্গায় এসে মা গঙ্গার কাছে পাঁচ টাকা সোয়া পাঁচ আনা মানত করেছিলেন, সে কথা ভোলেননি ভোম্বলদা। একটা খুচরো পাঁচটাকার নোট তার জন্য আগেই আলাদা করে ট্যাঁকে গুঁজে রেখেছেন।

এবারে রাস্তা পার হতে হবে। স্ট্র্যাণ্ড রোডের পূর্ব দিক ছেড়ে পশ্চিম দিকে।

ভোম্বলদা আরেকবার মনকে বললেন—'মন, তুমি সংকল্পে অটল থাকো। রাস্তা পার হলেই তুমি এক প্রবল আকর্ষণ অনুভব

করবে, ভাটিখানার আকর্ষণ। সে-আকর্ষণকে তোমার উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে হবে, চরৈবেতি।'

কঠোপনিষদের কঠিন বাক্য মনে মনে জপ করতে করতে ভোম্বলদা রাস্তা পার হলেন। পশ্চিম দিকের ফুটপাথে পড়েই ভোম্বলদার মনে পড়ে গেল দেশী মদের ভাটিখানায় ওর কিছু দেনা আছে। ভোম্বলদা ওই দোকানের বহু পুরোনো মক্কেল। বুড়ো রামরতন সিং আজ তিরিশ বছর ঐ দোকানে কাজ করছে। লোক সে চেনে। কে সাচ্চা আর নেকী হু'চার দিনের কথাবার্তায় আচার আচরণে সে বুঝে ফেলে। ভোম্বলদা দোকানের পুরোনো খদ্দের, মালিক থেকে চাকর বেয়ারা সকলেরই তিনি আপনার জন। সময়ে অসময়ে তাই হু'চার টাকা বাকি রাখতে ভোম্বলদার কোনো দিনই অসুবিধা হয়নি। এই রামরতনের কাছেই পাঁচ-টাকা বাকি রেখেছিলেন ভোম্বলদা। ধার দিতে রামরতন সব সময় প্রস্তুত, ধারের অঙ্কটা চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়তেই থাকে। তাছাড়া রামরতন জানে, নেশাখোর লোকেদের তুটো জায়গায় একদিন না একদিন আসতেই হবে। এক ভাটিখানায়, পরে শ্মশানে! সুতরাং ধার শোধ না করে পার পাবার কি উপায় আছে?

ভোম্বলদা স্থির করেছেন শত্রুর শেষ যেমন রাখতে নেই, ঋণের শেষও তিনি আজ রাখবেন না। যা পাওনা সব চুকিয়ে দিয়ে ভোম্বলদা লোটাকম্বল নেবেন।

শান-বাঁধানো ফুটপাথটার উপর দাঁড়িয়ে ভোম্বলদা আবার মনকে বোঝালেন—'মন, তুমি সবল হও। কঠিন কর্তব্য তোমার সামনে, কঠিনতম পরীক্ষা। প্রলোভনকে জয় করার তুরূহ পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।'

উপনিষদ ছেড়ে এবার গীতার শ্লোক মনে মনে অওড়াতে লাগলেন ভোম্বলদা। তুর্বলচিত্ত অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে উদ্বুদ্ধ

করেছিলেন সেইভাবেই ভোম্বলদা নিজের মনকে শক্তি সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন।

অবশেষে সংকল্পে স্থিরনিশ্চিত হয়ে ভোম্বলদা ঢুকে পড়লেন ভাটিখানায়। দোকানে ঢোকামাত্র মালিক থেকে শুরু করে ছোকরা চাকরগুলো পর্যন্ত সেলাম ঠুকে ভোম্বলদাকে অভ্যর্থনা জানালে। কোথা থেকে বৃদ্ধ রামরতন সিং গামছা হাতে ছুটে এসে একটা খালি বেঞ্চি আর টেবিল মুছে সাফ করতে লাগল।

ভোম্বলদা পর্বতের মত অটল অচল। বসবার কোনো আগ্রহই প্রকাশ করলেন না। গম্ভীর গলায় শুধু বললেন—'রামরতন, কত টাকা তুমি আমার কাছে পাবে?'

কথাটা যেন রামরতনের কানেই যায়নি। সে শুধু বললে, 'কি দেব? পাঁট না বোতল।'

'কিছুই দিতে হবে না, তুমি কত পাবে তাই বল।' ভোম্বলদার কণ্ঠস্বরে যেন বজ্রের গাম্ভীর্য।

অবাক হয়ে রামরতন ভোম্বলদার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে গেলে সে শুধু বললে—'হমার পাওনা টাকার জন্য ভাবছেন কেনো? পহলে আরাম করুন, খানাপিনা করুন, রূপয়া কা বাত পিছে হোবে। আজ কী আনিয়ে দেবো, কোস্‌সা মানসো না পিয়াজুঁ।'

ভোম্বলদা বেশ একটু রুক্ষস্বরেই বললেন—'ও সব কিছুই তোমাকে করতে হবে না। শুধু কত টাকা তোমার পাওনা সেইটাই বল।'

রামরতন এবার সত্যিই ঘাবড়ে গেল। গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ ভোম্বলদার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কোনো কথা না বলে গামছাটা কাঁধে ফেলে কাউন্টারে চলে গেল। একটা গ্লাস সোডা আর একটা পাঁট এনে ভোম্বলদার সামনের টেবিলে নিঃশব্দে রেখে দিয়ে বললে, 'বাবুজি, আপনার মেজাজ আজ বিলকুল গড়বড়

হোইয়েছে। আপনি আরাম কোরে ধীরে ধীরে আইস্তে খান। মেজাজ শরিফ হোনে সে বাদ রূপয়া কা বাত।'

রামরতন সোডার বোতল খুলে দিয়ে চলে গেল। ভোম্বলদা স্থিরদৃষ্টিতে বোতলটার দিকে তাকিয়ে থেকে মনকে ডেকে বললেন—'মন, এবার তোমার সামনে আসল পরীক্ষা উপস্থিত। শক্ত হও, দৃঢ় হও, কঠোর হও। কিন্তু মন, শাস্ত্রের কথা ভুলো না—প্রবৃত্তির মাঝেই নিবৃত্তি। উপনিষদের কথা ভুলো না—তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা। ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করো। সুতরাং এতদিনের একটা অভ্যাসকে যখন চিরকালের জন্য ত্যাগ করতে চলেছ তখন শেষবারের মতো একবার ভোগ করে নাও। শাস্ত্রীয় উপদেশ লঙ্ঘন না করলে সব পাপ স্খালন হয়।'

ভোম্বলদার এই যুক্তিতে মন কি বলল জানি না, ভোম্বলদা টেবিলের সামনে বসে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ত্যাগের আগে ভোগ করার পালা। ঘণ্টা দুই পার হবার পর খেয়াল হল আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরবার কথা। ভোম্বলদার মন আর ভোম্বলদা গলা জড়াজড়ি করে যখন দোকান থেকে বেরোলেন তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

এদিকে ভোম্বলদার পকেট তখন একেবারে ফাঁকা। রামরতনের বকেয়া পাওনা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ সমেত দিতে হয়েছে চোদ্দ টাকা, বাকিটা আছে ত্যাগের আগে ভোগ করার খেসারত বাবদ। পকেটে মাত্র কয়েক আনা পয়সা পড়ে আছে, আর আছে ট্যাঁকে গোঁজা সেই মা গঙ্গার কাছে মানত করা পাঁচ টাকার নোট।

ভোম্বলদা হেঁটে চলেছেন হাওড়ার পুলের দিকে এবং যেতে যেতে জড়িত কণ্ঠে মনকে সামাল দিচ্ছেন এই বলে—'মন, বিচলিত হয়ো না। ব্রহ্মের আস্বাদ তুমি পেয়েছো, সুতরাং মনে রেখো

ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা। চারিদিকে যা কিছু দেখছ, সবই মায়া। আমি মায়া, তুমি মায়া, এই জগৎ-সংসার সবই মায়া।'

ভোম্বলদা তখন গুনগুন করে রামপ্রসাদী সুরে গান ধরলেন,

'মন তুমি কৃষি কাজ জানো না।
এমন মানব-জীবন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।'

হাওড়া পুলের মাঝখানে এসেই ভোম্বলদা থামলেন। বাড়ি যাবার আগে এখনো তাঁর আর একটি কর্তব্য বাকি। আজই সকালে মাঝ গঙ্গায় এসে মায়ের কাছে মানত করে গিয়েছিলেন, এবং তা রক্ষা না করলে চিরজীবন মায়ের অভিশাপ কুড়োতে হবে।

মাঝ গঙ্গায় হাওড়া ব্রীজের পথচারীদের রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে ভোম্বলদা ট্যাঁক থেকে পাঁচ টাকার নোটটা বার করলেন। পকেটে যা-কিছু খুচরো ছিল তা থেকে গুনে গুনে সোয়া পাঁচ আনা বার করে নোটের মধ্যে জড়িয়ে সেটাকে একটা মার্বেলের আকার করে নিলেন।

এবার মা গঙ্গার কাছে মানত করা টাকাটা উৎসর্গ করার কাজটুকু বাকি। ডান হাতে পাঁচ টাকার নোটে জড়ানো সোয়া পাঁচ আনা পয়সা মুঠো করে ধরে কপালে ঠেকিয়ে ভোম্বলদা হাতটা মাথার উপর শূন্যে তুলে ধরলেন।

'মা, দেখিস মা', বলেই ভোম্বলদা ডান হাতের মুঠো দিলেন ছেড়ে। পাঁচ টাকার নোট মোড়া সোয়া পাঁচ আনা পয়সা পড়তে না পড়তেই বিদ্যুৎগতিতে বাঁ হাত দিয়ে খপ করে লুফে নিয়েই ভোম্বলদা বলে উঠলেন—'প্রসাদ দিবি না মা?'

বাঁ হাতের মুঠোয় টাকাটা চেপে ধরে রেখে ভোম্বলদা আবার মনকে ডেকে বললেন—'মন, দেখলি মা আমাদের প্রতি কতখানি প্রসন্ন। টাকাটা হয়তো তিনি আমাদের ফিরিয়ে না-

ও দিতে পারতেন। ভক্ত প্রসাদ চাইলে মা কি তা না দিয়ে পারেন ? জয় মা পতিতপাবনী, ইচ্ছাময়ী মা আমার।'

মায়ের দেওয়া প্রসাদ, সে কি প্রত্যাখ্যান করা যায় ?

ভোম্বলদা দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে টাকার বদলে প্রণাম নিবেদন করে যে-পথ দিয়ে এসেছিলেন সে-পথেই আবার ফিরে গেলেন সেই ভাটিখানায়। আবেগজড়িত কণ্ঠে তিনি তখন স্বামী বিবেকানন্দ রচিত গান ধরেছেন—'মন চলো নিজ নিকেতনে।'

তারপর দিন থেকে ভোম্বলদা নিরুদ্দেশ, কেউ কোন খোঁজ তাঁর পায়নি।

বাইরে দূরে

ভোম্বলদাকে তার পর থেকে সত্যিই আর দেখা যায়নি। সুতরাং ভোম্বলদাকে নিয়ে আরো কিছু কাহিনী যে আপনাদের শোনাবো তার আর উপায় নেই। শুনেছি, চাকরি সংসার—অর্থাৎ কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করে শ্মশানচারী হয়েছেন, কিন্তু কোন শ্মশানে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন তার হদিস কারো জানা নেই।

সবার উপরে মানুষ সত্য কথাটা যেমন নিখাদ সোনার মতো খাঁটি, তেমনি সবার উপরে মানুষ বিচিত্র, এই কথাটাও আজকের দিনে কিছু খাদ-মেশানো সোনার মতোই খাঁটি—যা দিয়ে ইচ্ছে-মতো গালিয়ে গড়ে পিটে নানান রকমের নক্‌শা তোলা যায়। ভোম্বলদার কথা যা শুনেছি তার থেকে এইটুকুই সার সত্য আমি বুঝেছিলাম যে, এই বিচিত্র চরিত্রের মানুষ ভোম্বলদা সেই কিছু খাদ-মেশানো খাঁটি সোনার মানুষ। এ ধরনের মানুষ সংসারে বিরল। কেননা প্রবঞ্চনা, শঠতা, মিথ্যা আর কুটিলতায় ভরা আজকের জগতে এঁরা টিকে থাকতে পারেন না, নেপথ্যে সরে যেতেই হয়।

ভোম্বলদাকে আমি চাক্ষুষ দেখিনি, শুধু তাঁর গল্পই শুনেছি।

আমি আসলে আরামবিলাসী লোক, ভ্রমণবিলাসী নই। কলকাতা শহরের দক্ষিণাঞ্চলে আমার তিনতলা ফ্ল্যাটের ছোট্ট ঘরখানিতে খাটের উপর তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খবরের কাগজে মুখ গুঁজে ছুনিয়া দেখা আমার ছত্রিশ বছরের অভ্যাস। এ-হেন লোককে কিনা অবশেষে যেতে হল বিদেশ ভ্রমণে! ১৯৬১ সাল, সে-ই আমার প্রথম সাগরপাড়ি। পশ্চিম জার্মানীতে তিন সপ্তাহ ধরে আমার এই স্থূল দেহকে লাট্টুর মতো ঠাসবুনোট ভ্রমণ-সূচীর লেত্তিতে বেঁধে বন্ বন্ করে বার্লিন থেকে

কলোন, কলোন থেকে বন্, বন্ থেকে ডসেলডর্ফ ইত্যাদি ঘোরাতে ঘোরাতে অবশেষে যখন ম্যুনিখ থেকে লণ্ডনে এনে ফেললে তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। কন্ডাক্‌টেড্ ট্যুর ব্যাপার-টাই ততদিনে আমার কাছে আতঙ্কে পরিণত হয়েছে। নিজের মন-মেজাজ অবসর ও অবকাশ নিয়ে চলাফেরার সুযোগ তোমার নেই, তুমি যেন জুড়িগাড়ির একটি ঘোড়া। সকাল আটটা থেকে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত ছুটে চলাই তোমার কাজ। থেকে থেকে ভ্রমণ-সূচীর সময়নির্দেশক চাবুকটি শপাং শপাং করে পিঠের কাছে আওয়াজ তুলে জানান দিচ্ছে—নাই নাই নাই যে সময়।

লণ্ডন এয়ার পোর্ট থেকে বাস্‌টা যখন শহরের টার্মিনাসে এসে পৌঁছল, লণ্ডন-প্রবাসী কয়েকজন বাঙালী বন্ধু অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন—'জাঁতাকলে ফেলে খুব ঘুরিয়ে মেরেছে তো? এবার লণ্ডন এসেছেন, কয়েকদিন ছুটি উপভোগ করুন।'

লণ্ডন শহরে আমি নতুন মানুষ এসেছি। কিন্তু শহরে পা দিয়েই মনে হল এ-যেন আমার কতকালের চেনা। কলকাতার সঙ্গে লণ্ডনের ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত কিছু সান্নিধ্য আছে বলেই কি এ-শহর আমার কাছে অপরিচিত বলে মনে হল না? ঠিক তা নয়। আশৈশব লণ্ডন শহরের ইতিকথা শুনেছি, ছবি দেখেছি। শহরের একটা কল্পরূপ আমার মনে বহুকাল ধরেই আঁকা। এই শহর সম্পর্কে যে-ধারণা এতকাল মনের মধ্যে লালন করে এসেছি, তাকে প্রত্যক্ষ গোচরের দ্বারা মিলিয়ে দেখাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। বহু ক্ষেত্রেই আমার ধারণার সঙ্গে মিলেছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেলেনি। যা মেলেনি তার অন্যতম দৃষ্টান্ত ছুটির দিনের লণ্ডন।

হুইট্‌সন্ ছুটির মুখেই লণ্ডনে এসেছি। শনিবার বেলা একটা পর্যন্ত কাজ হয়েই তিন দিন ছুটি। আমার ধারণা ছিল, লণ্ডন-আকাশের হিমেঢাকা ঘোমটাখানি সব সময় ধূমল রঙে

আঁকা। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটল। নির্মল নীল আকাশ, সোনাঝরা রোদ্দুরে শহর ঝলমল করছে। শীতের দেশ ইংলণ্ডে গ্রীষ্মকাল শুরু, তদুপরি তিন দিন ছুটি আর আকাশ ভরা সূর্যের আলো। এমন দিনে ঘরে থাকা যায়? দলে দলে বেরিয়ে পড়েছে ঘর থেকে পথে, শহর থেকে অদূরে টেমস্ নদীর উপকূলবর্তী শ্যামল বনভূমিতে।

সকালে এসে লণ্ডনে পৌঁছেছি। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম শহরের রাস্তায়। এ-শহরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নবাগন্তক এখানে নিজেকে কখনই অনাবশ্যক বোধ করে না। কে বা আপন কে বা অপর, তাই নিয়ে মাথা-ঘামানো লণ্ডন শহরের কাজ নয়। সবার পরশে পবিত্র করা এই মহানগরী মহামিলনের তীর্থক্ষেত্ররূপে আজ উষ্ণ হৃদয়ের আহ্বান জানিয়ে বলছে—'হে বিদেশী, এসো এসো।'

কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম জনমানবশূন্য পথ দেখে। সকাল-বেলায় যে-রাস্তায় লোক গিজ্‌গিজ্ করছিল, বিকালে সে-পথ শ্মশানভূমি। আমরা ঘরমুখো বাঙালী। ছুটির দিনে ঘরেই শুয়ে বসে গড়িয়ে তাস পিটিয়ে দিন কাটাই। আর এরা? ছুটির দিনে বারমুখো শুধু নয়, একেবারে শহর-বিরাগী। শহর থেকে এক বেলার মধ্যে কোথায় যেন সব উধাও হয়ে গেল। নির্জন গ্রাণ্ট স্ট্রীট দিয়ে আমরা কয়েকজন হেঁটে চলেছি, ট্রাফাল-গার স্কোয়ারের পায়রাগুলি নেলসন কলামের চারপাশে পাক খেয়ে ইতস্তত উড়ে বেড়াচ্ছে, ছোলা খাওয়াবার লোকের আজ বড়ই অভাব। নীরব নির্জন লণ্ডন নগরীর অবস্থা দেখে আমি যখন হা-হুতাশ করছি, তখন আমার সহযাত্রী বন্ধু সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ বললেন—'শবদেহ নিয়ে কান্না কেঁদে কী হবে! তার চেয়ে চলুন কাল সকালে আমরাও বেরিয়ে পড়ি সমুদ্রের ধারে, যেখানে সবাই গেছে।'

পরামর্শ চলল কোথায় যাওয়া যায়। সাউথ-এণ্ড, হেস্টিংস না ব্রাইটন। বন্ধুবর বললেন—'ব্রাইটনেই চলুন। শুনেছি ওখানকার সমুদ্রতীর এখানকার বড়লোকদের অবকাশ বিনোদনের প্রশস্ত ক্ষেত্র।'

পরদিন সকালে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। টিকিট ঘরের জানালা থেকে লম্বা কিউ জিলিপির প্যাঁচের মতো চলে গিয়েছে, কোথায় তার শেষ, খুঁজে পাওয়া শক্ত। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর যাত্রীবোঝাই ট্রেন ছুটে চলেছে ব্রাইটনের পথে। দ্রুতগামী অথচ মধ্যবর্তী কোনো স্টেশনে থামবে না এমন একটি ট্রেনে ছুটতে ছুটতে গিয়ে উঠে পড়লাম, বসবার জায়গা নেই।

একঘণ্টা পর বেলা এগারোটায় ব্রাইটন স্টেশন টারমিনাসের প্ল্যাটফর্মে কয়েক হাজার লোক ছিটকে পড়ল। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী, খোকা-খুকু—এক বিরাট জনস্রোত জলস্রোতের মতো ছুটে চলেছে সমুদ্রের দিকে। এমন কি তিন মাসের ঘুমন্ত শিশুটিকে প্র্যামবুলেটারে দ্রুত পদক্ষেপে ঠেলে নিয়ে চলেছে মা।

বালুকাবেলা নয়, উপল উপকূল। উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা নেই, ধীর স্থির শান্ত সমাহিত সমুদ্র। যত বেলা বাড়ছে, উন্মত্ত হয়ে উঠছে নুড়িবিছানো তীরভূমি। রঙ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। সাজ-পোশাকে রঙ, রঙ লেগেছে মনেও। ওভারকোট আর ম্যাকিনটশ পেতে আলিঙ্গনাবদ্ধ শত শত যুগল মূর্তি এপাশ-ওপাশ ছড়ানো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করছে তারি মাঝে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ছ'পেনীর ভাড়া-করা ডেক্‌চেয়ার পেতে সমুদ্রের দিকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি মেলে ভাবছে তাদের যৌবনকালের কথা। তাদের কালে কি এ-ভাবে ছুটি উপভোগ করতে পারত?

কে যেন বলছিল, গত যুদ্ধের পর এদেশের তরুণ-তরুণীদের

মনোভাব বেশ খানিকটা পালটে গেছে। শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এরা অনুধাবন করছে কিনা জানি না, তবে দু'-দুটো যুদ্ধের পর এ-সত্য তারা হাড়ে হাড়ে বুঝছে যে, জগৎ অনিত্য, সুখ ক্ষণস্থায়ী। আনন্দের যে-মুহূর্তটুকু তুমি মুঠোয় পেয়েছ তাকে পূর্ণ করে উপভোগ করো। যাকে কাছে পেয়েছ তাকে হারাবার ভয় বড় বেশি বলেই যতক্ষণ কাছে পায় তাকে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে রাখে।

আমরা ভারতীয়, আমাদের অনভ্যস্ত চোখে এ-দৃশ্য কিঞ্চিৎ বিসদৃশ বলে মনে হয়। এদের জীবনে হয়তো এইটিই আজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কাজের দিনে এরা নানা কাজের মানুষ, ছুটির দিনে এরা তাই দু'টি স্বপ্নমদির আঁখি আর সুখনিবিড় বাহু-বল্লরীর বন্ধনে সহজেই আত্মসমর্পণ করে।

বেলা দ্বিপ্রহরে যে-যার বান্ধবী নিয়ে সমুদ্রতীর সংলগ্ন পাব আর রেস্তোরাঁয় ভিড় জমিয়েছে পানাহারের সন্ধানে। দাঁড়াবার জায়গা নেই, কাউন্টারের উপর গ্লাস নিয়ে পানীয়ের জন্য ঠেলাঠেলি। কী ব্যাপার। এত তাড়াহুড়ো কেন। ওদিকে রেস্তোরাঁর অভ্যন্তরে সংকীর্ণ স্থানে একটি ইতালীয় তরুণ গান করে চলেছে, তারি ছন্দে যে-যার বক্ষোলগ্না বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরে উন্মত্ত হয়ে নেচে চলেছে ইংরেজ যুবকদল।

সহসা বারটেণ্ডার তারস্বরে চিৎকার করে বললেন—'নো মোর ড্রিঙ্কস্, নো মোর ড্রিঙ্কস্।'

হঠাৎ অবেলায় পানীয় নিষিদ্ধ হল কেন বুঝতে পারলাম না। কাউন্টারের একধারে এক প্রৌঢ় ইংরেজ কোলাহলের মধ্যে নিজেকে নির্লিপ্ত রেখে আপন মনে বীয়ারের গেলাসে চুমুক দিচ্ছিলেন। সঙ্কোচের সঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—'হঠাৎ এখন ড্রিঙ্কস্ বন্ধ হবার কারণটা জানতে পারি?'

'বেলা দুটো বেজেছে।'

'বেলা ছটোয় পানীয় বন্ধ, এ রকম তো আর কোথাও শুনিনি।'

'তা হয়তো শোনোনি, তবে এখানে আইন করে বন্ধ করা হয়েছে।'

সুকুমার রায়ের আবোলতাবোল-এর 'একুশে আইন' কবিতাটি মনে পড়ে গেল। এটাও কি তাহলে কোনো আজব দেশের রাজার আইন?

প্রৌঢ় আবার বললেন—'ছুটির দিনে দলে দলে শহুরে ছোকরারা এখানে ছুটি উপভোগ করতে এসে পানোন্মত্ত হয়ে হুজ্জুত করে। স্থানীয় অধিবাসীদের আপত্তিতেই সরকার এই আইন প্রবর্তন করেছেন। ব্রাইটন থেকে লণ্ডনের শেষ ট্রেন ছাড়ে সন্ধ্যা ছ'টায়। যে ভিড় এখন দেখছেন, ছ'টার মধ্যেই তা ফাঁকা হয়ে যাবে। সুতরাং আবার ছ'টার পর যথারীতি পানাগারগুলি খোলা হবে।'

প্রৌঢ়কে ধন্যবাদ জানিয়ে পথে নেমে পড়লাম। সাহিত্যের মারফত এদেশের রাগী ছোকরার দলের কথা কিছু কিছু জানা ছিল। এ-ব্যবস্থা তারি পরিণতি কি না জানিনে, তবে আমরা ছু'জন স্থানত্যাগ করে স্টেশনের দিকেই হাঁটা দিলাম। এতক্ষণ এ-তল্লাটে পুলিসের চিহ্ন মাত্র ছিল না, এখন দেখছি গাড়িভর্তি পুলিস এসে হাজির। সমুদ্রতীরের শালীনতা রক্ষার জন্যই বোধ-হয় ওদের সহসা আবির্ভাব।

বেলা তখন তিনটে। আমাদের ফেরার কথা ছিল বিকেল ছ'টায়। কিন্তু যে দৃশ্য এতক্ষণ ধরে দেখেছি তার নেশা মনকে এমন অবসাদগ্রস্ত করে ফেলেছে যে, একরাশ বিরক্তির বোঝা নিয়ে একটা লণ্ডনগামী ট্রেনের কামরায় উঠে বসলাম। এবার এক্সপ্রেস ট্রেন নয়, প্যাসেঞ্জার ট্রেন, সব স্টেশনে থামতে থামতে যাবে।

ফাঁকা ট্রেনের একটি কামরায় উঠে পড়লাম। চারজন করে

মুখোমুখি আটজনের বসবার কামরা, পুরু গদী-আঁটা সীট। এক কোণায় একটি ইংরেজ যুবক একমনে বই পড়ছেন। গায়ের রেন-কোটটা পাশে খুলে রেখে হাত-পা ছড়িয়ে আমরা দু'জন বসলাম। ক্লান্তির অবসানের জন্য এখন একটু ঘুম দরকার।

ট্রেন ছাড়তে তখনো মিনিট দু'তিন বাকি। প্ল্যাটফর্মে তাকিয়ে দেখি এক বৃদ্ধ ইংরেজ কোনো রকমে টলতে টলতে আসছেন আর একেবারে আমাদের কামরার সামনেই এসে হাজির। বৃদ্ধ নেশায় বুঁদ। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে মাথার ফেল্ট হ্যাটটা একটু উঁচু করে তুলে আমাদের তিনজনকে উদ্দেশ করে বললেন—'গুড আফটারনুন। এখানে বসতে পারি?'

বৃদ্ধের কথা জড়িয়ে আসছে, পা টলছে। কিন্তু ইংরেজ আভিজাত্যের সবকিছু ছাপই তাঁর সর্বাঙ্গে বর্তমান। হাতে ছড়ি, ছড়ির বাঁটের সঙ্গে হাতের দস্তানা দুটো ধরা। স্বস্থানে বসেই বৃদ্ধ প্রথম ওয়েস্ট কোট-এর বোতামের ঘরের সঙ্গে চেন-বাঁধা ঘড়িটা বার করে দেখে বললেন—'গাড়ি ছাড়তে এখনো দু'মিনিট বাকি।'

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, আশেপাশে এত ফাঁকা কামরা থাকতে বৃদ্ধ আমাদের কামরাতেই উঠলেন কেন। নেশাখোর মানুষের গল্প করার লোকের প্রয়োজন হয়। সারাটা পথ সময় কাটাবার জন্যে বোধহয় গল্প করতে চান, তাই উপলক্ষ খুঁজছেন।

আমাদের তরফ থেকে খুব বেশি সাড়া পেলেন না, ইংরেজ যুবকটিও বই পড়ায় মগ্ন।

বৃদ্ধ আবার জড়িত কণ্ঠে বললেন—'জানেন, সকাল থেকে অত্যধিক মদ্যপান করেছি। আরও করবার ইচ্ছে ছিল।'

তথাপি আমরা নিরুত্তর। ইংরেজ যুবক বইয়ের পাতা উল্টে অপর পাতায় মনোনিবেশ করলেন।

বৃদ্ধের গল্প করবার ঝোঁক চেপেছে, নাছোড়বান্দা। এবার আমাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করলেন—

'তোমরা কি কিঙস্ ইণ্ডিয়া থেকে এসেছো ?'

আর যায় কোথা। আমার সহযাত্রী সন্তোষ ঘোষ একটু রগচটা, ওটা বয়সের দোষ। তার উপর ব্রাইটনবীচের ও-সব কাণ্ডকারখানা দেখে মন-মেজাজ গোড়া থেকেই খিঁচিয়ে ছিল। ফোঁস করে উঠলেন। বললেন—'কিঙস্ ইণ্ডিয়া বলতে তুমি কোন্ দেশকে বোঝাচ্ছ ?'

বৃদ্ধ তেমনি জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন—'রেড ইণ্ডিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ার সঙ্গে তফাত করার জন্যে তোমাদের দেশটাকে আমরা কিঙস্ ইণ্ডিয়া বরাবরই বলে থাকি।'

আমার সঙ্গীর অপমানবোধ খুবই টনটনে। বিশেষ করে বিদেশে ভারতবর্ষ সম্পর্কে কেউ যদি অবমাননাকর কোনো মন্তব্য করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ জান লড়িয়ে দিতে প্রস্তুত। বৃদ্ধের কথার জবাবে সঙ্গে সঙ্গে বলে বসলেন—

'তুমি দেখছি তোমাদের দেশের রিপ্ ভ্যানউইঙ্কিল-এর এক নতুন সংস্করণ। চোদ্দ বছর ধরে বুঝি ব্রাইটনের ভাঁটিখানায় পড়ে ছিলে, আজ প্রথম উঠে এসেছো। আমাদের দেশ যে আর কিঙস্ ইণ্ডিয়া নয়, এমন কি তোমাদের কুইনস্ ইণ্ডিয়াও নয়, সে খবর বুঝি এতদিন জানবার সুযোগ পাওনি ?'

বৃদ্ধের মুখ লাল হয়ে উঠল, গুম হয়ে বসে রইলেন। পরের স্টেশনে গাড়ি থামতেই ছড়ি টুপি দস্তানা গুছিয়ে নিয়ে বৃদ্ধ উঠে পড়লেন, নেমে গেলেন প্ল্যাটফর্মে। বোধহয় এইটিই ওঁর গন্তব্য-স্থল। কিন্তু অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করলাম, বৃদ্ধ টলায়মান অবস্থায় পাশের কামরায় উঠে পড়লেন। কোণায় বসা ইংরেজ যুবকটির দিকে তাকিয়ে দেখি, বইয়ের পাতায় তখনো তার দৃষ্টি আবদ্ধ মুখে কৌতুকের হাসি।

২

ঘর হতে যার আঙিনা বাহির, তাকে কিনা ছ'মাসের জন্য সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যেতে হল সুদূর আমেরিকায়। আমি স্বভাবত ঘরকুনো। কলকাতা শহরে বাড়ি আর আপিস, আপিস আর বাড়ি—এই চৌহদ্দিব মধ্যেই আমার আনাগোনা। বছরে ছবার কলকাতা ছেড়ে একশ' মাইল দূরে পৈতৃক ভিটে শান্তিনিকেতন পর্যন্তই আমার দৌড়। ছ-একবার যে দিল্লী বোম্বাই কারিনি তা নয়, তবে হয় তা সপরিবারে, অথবা সবান্ধবে। সঙ্গীরিক্ত দেশভ্রমণে আমি অভ্যস্ত নই।

১৯৬১ সালে প্রথম যেবার ইংলণ্ড ও ইয়োরোপ ভ্রমণে যাই সে-বার সঙ্গে ছিলেন চারজন সমধর্মী ঝানু সাংবাদিক। প্রত্যেকেরই চালচলন, কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও সাজপোশাকে একাধিকবার সদ্য বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ছাপ তখনো উজ্জ্বল। সুতরাং আমার মতো ঘরকুনো লোকের প্রথম শূন্যে পাড়ি দিয়ে বিদেশ যাওয়া কিছুমাত্র ক্লেশকর ছিল না। বয়সে কিঞ্চিৎ বড় হলেও নাবালক শিশুটির মতো বিদেশ ভ্রমণের পাঠ তাঁদের কাছ থেকে আমাকে পদে পদেই নিতে হয়েছে। 'হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা' বলে সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষের হাতে আমি নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছিলাম। তিনিও 'হাঁটি হাঁটি পা পা' করে আমাকে পশ্চিম জার্মানী, ভিয়েনা, সুইটজারল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রোম দেখিয়েছেন, আমি ছায়ার মতো তাঁকে শুধু অনুসরণ করেছি। নিজেকে সম্পূর্ণ তাঁর হাতে সঁপে দেওয়ায় আমার যেমন এই ভ্রমণের কোনো ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয়নি, তেমনি স্বাবলম্বী হবার সুযোগও আমি পাইনি।

তুইমাস একত্রে ইয়োরোপ ঘোরার পর ফেরার পথে রোম শহরের এয়ার-টার্মিনাস-এ একটু নিজের পায়ে দাঁড়াবার উদ্যোগ করায় প্রচণ্ড ধমক খেতে হয়েছিল সঙ্গী সন্তোষকুমারের কাছ থেকে, যার ফলে তিন ঘণ্টা বাক্যালাপ বন্ধ ছিল। কলকাতায় অনুরূপ কিছু ঘটলে অন্তত তিন মাস বাক্যালাপ দূরের কথা, মুখ দেখাদেখিই বন্ধ হয়ে যেত।

হোটেল থেকে পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে একটা ট্যাক্সি করে তু'জনে রোম শহরের এয়ার-টার্মিনাস-এ এসে পৌছেছি। আমরা লুফৎহানসা এয়ার সার্ভিসের যাত্রী, ফিরব কাইরো করাচী হয়ে কলকাতা। শহরের মাঝখানে বিরাট টার্মিনাস, বাইরে সারে সারে বিভিন্ন এয়ার লাইনস-এর বাস দাঁড়িয়ে। যার যখন উড়বার কথা তার একঘণ্টা আগে এইসব বাস তাদের বিমান বন্দরে পৌছে দেবে।

বিরাট হল, তার মধ্যে কাঠের ফ্রেম দিয়ে তৈরী বিভিন্ন এয়ার সার্ভিসের ছোট ছোট খুপরী। প্রত্যেক খুপরীতে একজন লোক বসে। কোনো কোনো খুপরীতে তরুণীও আছে। তাদের কাজ যাত্রীদের সঠিক সন্ধান দেওয়া—কখন ফ্লাইট, কখন টার্মিনাস থেকে বাস যাত্রীদের নিয়ে বিমান বন্দরের দিকে যাত্রা করবে। বি-ও-এ-সি, প্যান-আমেরিকান, আলিটালিয়া, এয়ার ফ্রান্স, এস-এ-এস ইত্যাদির কাউণ্টার পার হয়ে লুফৎহানসার খুপরী খুঁজে পাওয়া গেল। সন্তোষবাবু আগে চলেছেন, আমি আছি তাঁর পিছনে। লুফৎহানসার কাউণ্টারের সুদর্শনা তরুণীটির সঙ্গে কথা বললেন সন্তোষবাবুই—কারণ বরাবরই ব্যাপারটা ছিল আমার এক্তিয়ারের বাইরে। সন্তোষবাবু আমাকে বললেন যে, টার্মিনাস থেকে বাস ছাড়তে এখনো এক ঘণ্টার উপর দেরি! অগত্যা জিনিসপত্র নিয়ে কাউণ্টারের সামনে একটা বেঞ্চির এক-পাশে বসে পড়লাম। দেশ-বিদেশের যাত্রীদের ভিড়—তরুণ-

তরুণী, ছেলেমেয়ে, বুড়ো-বুড়ী সবাই এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে। দু-তিন মিনিট অন্তর এক-এক কাউন্টার থেকে মাইক্রোফোনে ইতালীয় ও ইংরেজী ভাষায় কিছু একটা ঘোষণা হতেই যাত্রীদের মধ্যে সাড়া জাগে, কোনো কোনো যাত্রী কাউন্টারে গিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে আসছে।

দু'জনে পাশাপাশি বসে আছি, দীর্ঘ সময় কী করে কাটাই। সংলগ্ন রেস্তোরাঁয় বসে গরম অথবা ঠাণ্ডা পানীয় নিয়ে সময় কাটাবো তার উপায় নেই, পকেটের অবস্থা তখন শূন্যের কোঠায়। একমাত্র ভরসা, আমরা ছিলাম প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। সুতরাং বিমানে খাদ্য পানীয় ইত্যাদি নিখরচায় পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম। বিদেশী মুদ্রার যেটুকু সঞ্চয় সঙ্গে ছিল তা ক্যাব ড্রাইভারকে চুকিয়ে দেওয়ার পর আমরা প্রায় মুক্ত পুরুষ। অগত্যা বেঞ্চিতে বসে অন্যান্য বিদেশী যাত্রীদের চাল-চলন সাজ-পোশাক দেখে দু'জনে গবেষণা করতে লেগে গেলাম—কে কোন দেশের যাত্রী। এ-ভাবে আধ ঘণ্টার উপর সময় পার হবার পর সন্তোষবাবু বললেন—'আজ সকাল থেকে কোনো খবরের কাগজ চোখে দেখা হয়নি কী করা যায় বলুন তো?'

হুঁকো-কলকেয় একবার গুড়ুক-টান না দিতে পারলে তামাকসেবীর যেমন পেট ফুলে ওঠে, সকালবেলায় দুনিয়ার সংবাদের উপর অন্তত একবার চোখ না বোলাতে পারলে সাংবাদিক সন্তোষকুমারের ছটফটানি শুরু হয়ে যায়। আমি বললাম—'একটু খোঁজ করে দেখুন না, নিশ্চয় কাছেপিঠে কোথাও খবরের কাগজের স্টল আছে। একটা ইংরেজী কাগজ পেয়ে যেতে পারেন।'

কথাটা সন্তোষবাবুর মনঃপূত হওয়ায় তখুনি উঠে পড়লেন এবং যাবার সময় পইপই করে বলে গেলেন—'খুব সাবধান। বেঞ্চি ছেড়ে কোথাও যাবেন না। জিনিসপত্রের উপর কড়া নজর রেখে

বসে থাকুন, ইটালী দেশটার কিন্তু ও-বিষয়ে ভারতবর্ষের মতোই সুনাম। আমি কাগজ কিনে এক্ষুনি চলে আসছি।'

ছোটো ছেলেকে স্টেশনে মালপত্রসহ বসিয়ে রেখে অভিভাবক যেমন পানটা সিগারেটটা অথবা টিকিট কিনতে যান, তেমনি সন্তোষবাবু আমাকে বসিয়ে রেখে পত্রিকার সন্ধানে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

চুপচাপ বসে আছি আর শুনছি বিভিন্ন কাউন্টার থেকে বিদেশী ভাষায় কী-সব ঘোষণা করে চলেছে ; তার কিছুই আমার বোধগম্য নয়। হঠাৎ নজরে পড়ল লুফৎহানসার কাউন্টারের সেই সুন্দরী তরুণী মাইক্রোফোনটা মুখে লাগিয়ে কী যেন বলে চলেছে। মনে হল, বিমান বন্দরে প্লেন আসা-যাওয়ার সময়-সূচক কোনো সংবাদ হবে। প্লেন হয়তো বিমান বন্দরে এসে পৌছবার সময় হয়ে গিয়েছে ; বাস হয়তো অবিলম্বে যাত্রীদের নিয়ে রওনা হবে। সন্তোষবাবুও কাছে নেই, এখন উপায় ? বাস যদি আমাদের ফেলে চলে যায়! পকেট তো গড়ের মাঠ। শহর থেকে পঁচিশ মাইল দূরের বিমান-বন্দরে যাবার ট্যাক্সিভাড়া পাবো কোথায়! আর যদি আজকের প্লেন-এ যেতে না পারি তাহলে তো রোম শহরে আরেক রাত্রি বাস করতে হবে, কিন্তু হোটেলে তো স্থান জুটবে না। একটা আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তায় পড়ে তরুণীর কাছে গিয়ে সঠিক সংবাদটি জানবার কৌতূহল কিছুতেই নিবৃত্ত করতে পারলাম না। সন্তোষবাবুর খড়ির দাগকে উপেক্ষা করেই বেঞ্চি ছেড়ে লুফৎহানসার কাউন্টারে এসে সুন্দরী রমণীটিকে সবেমাত্র প্রশ্ন করতে যাচ্ছি, এমন সময় শোনা গেল একটা চাপা গর্জন—'আপনাকে না বলেছিলাম বেঞ্চিতে বসে থাকতে ?'

আমি অপ্রস্তুত। সুন্দরীটি বঙ্গভাষা বুঝতে না পারলেও প্রকাশভঙ্গীর ধরনটা অনুমান করে অবাক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

সন্তোষবাবু একটা ইংরিজি পত্রিকা হাতে ঠিক তন্মুহূর্তেই কাউন্টারে এসে উপস্থিত হবেন, ধারণা করতে পারিনি। থমথমে গম্ভীর মুখ। রেগে গেলে রক্ষে নেই, মুখে তুলকালাম শুরু হয়ে যাবে। সন্তোষবাবুর মুখচোখের অবস্থা দেখে অনুমান করলাম, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—ঝড় উঠবে।

উঠলও। রাগে অভিমানে ফেটে পড়লেন।—'আপনি তাহলে আমার উপর বিশ্বাস হারিয়েছেন। তাই নিজেই খোঁজ করতে এসেছেন কখন বাস্ ছাড়বে। দু' মাস ধরে সারা ইউরোপ আপনাকে আগলে রেখে এত ঘোরাঘুরি করেছি, অবিশ্বাসের কোনো কারণ ঘটেছিল কি? আজ কেন আপনি আমার উপর আস্থা না রেখে, আমার উপর নির্ভর না করে এবং আমার কথা উপেক্ষা ও অবিশ্বাস করে জানতে এসেছেন কখন বাস ছাড়বে? আমি কি আপনাকে ফেলে পালিয়ে যেতাম?'

বন্যার তোড়ের মতো আমাকে বাক্যবাণে জর্জরিত করে থামলেন।

অপরাধ করে ফেলেছি, তাই গলাটা যতখানি সম্ভব মোলায়েম করে বললাম—'আপনি যা ভেবেছেন ঠিক তা নয়। মহিলাটি এইমাত্র কী একটা মাইক্রোফোনে বললেন, আমি কথাগুলি বুঝতে পারিনি। হয়তো আমাদের বাস ছাড়বার সময়ের কিছু পরিবর্তন হয়েছে মনে করেই আমি জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম।'

এ-যুক্তি গ্রাহ্যেই আনলেন না। রাগে দুঃখে অভিমানে উত্তেজিত কণ্ঠে সন্তোষবাবু বললেন—'আপনি যখন আমাকে একবার অবিশ্বাস করেছেন, নিজেই নিজের ভার নেবার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন, তখন আপনার কাছে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আপনার সঙ্গে এখন থেকে আর আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আপনি নিজেই নিজের পথ দেখুন, আমি আমার।'

হন্‌হন্‌ করে চলে গেলেন সন্তোষবাবু। পরিত্যক্ত বেঞ্চিটার উপর বসে উল্টো দিকে ফিরে খবরের কাগজে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন।

আমিও পূর্ববঙ্গের সন্তান, আমিও ঘোষের বাচ্চা। রাগ আমারও কি কিছু কম? দুম্‌ দুম্‌ করে হেঁটে গিয়ে আমার স্যুটকেস্‌ ও এয়ারব্যাগটা এক ঝটকায় তুলে হল ঘর থেকে সোজা বেরিয়ে এলাম রাস্তায়, যেখানে এয়ার-সার্ভিসের বাসটা দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভারের জিম্মায় বাক্সটা গছিয়ে দিয়ে বাসে উঠে একেবারে সামনের সিট-এ বসে পড়লাম—এবার যখন খুশি বাস ছাড়ুক, এরোপ্লেনে উঠে পড়তে পারলে আর আমার ভাবনা কি। মন-মেজাজ খুবই খারাপ, রাস্তার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে আছি। মিনিট কুড়ি পরে লুফৎহানসার যাত্রীরা একে-একে সবাই বাসে উঠতে লাগল; সন্তোষবাবুও তাঁর এয়ার-ব্যাগ নিয়ে বাসের পিছনের দিকে গম্ভীর মুখে বসে পড়লেন। ওঁর মুখের ভাবটা আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে আমিও ততোধিক গম্ভীর, মুখ রাস্তার দিকে ফেরানো। এয়ার পোর্টে এসেও যে-যার পথে চলেছি অনেকখানি ব্যবধান রেখে। পাসপোর্ট ভিসা ইমিগ্রেশন ইত্যাদির প্রতিবন্ধক পার হয়ে ট্রানজিট লাউঞ্জে গিয়ে উপস্থিত, সেখানেও দু'জন দু'জায়গায় দুদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে।

বিমানে ওঠার দরজাটা খুলে দেওয়া মাত্র সন্তোষবাবু তড়বড়িয়ে ছুটে গেলেন আগেই, পাছে আমার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যায়, পাছে কথা বলে ফেলতে হয়। কিন্তু অসুবিধা দেখা দিল বিমানে উঠে।

প্রথম শ্রেণীতে পাশাপাশি দুটি বসবার সীট। আমাদের দু'জনের সীটের নম্বরও পাশাপাশি। অগত্যা সন্তোষবাবুর পাশেই আমাকে বসে পড়তে হল। উভয়েরই মুখ থমথমে, বাক্যালাপ বন্ধ।

মাথার উপর আলোর অক্ষরে জ্বলে উঠল: "ধূমপান করবেন না, আসনের বেল্‌ট এঁটে নিন।" এবার প্লেন ছাড়বার সময়। পশ্চিম জার্মানীর বিমান যখন, তার পরিচারিকা দু'টি জার্মান তরুণী ত্রস্তপদে এ-দিক ও-দিক আসা-যাওয়া করছে। যাত্রীদের কাছে এসে স্মিতহাসির সঙ্গে এগিয়ে ধরছে লজেন্স-এর ট্রে অথবা সিগারেটের প্যাকেট। একটি সুঠামদেহী এয়ার-হোস্টেস চকিত নয়নে পাশাপাশি বসা দুই ভারতীয়ের গম্ভীর মুখ দেখে লজেন্স আর সিগারেট নিয়ে এল। তাতেও আমাদের ভাবের অভিব্যক্তির কোনো পরিবর্তন নেই। পাশ দিয়ে আসা-যাওয়ার সময় প্রতিবারই চপল কটাক্ষে আমাদের নিরীক্ষণ করছিল।

আন্তর্জাতিক বিমানের এয়ার-হোস্টেসরা যাত্রীদের পরিচর্যা করে থাকে খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে। কিন্তু তাদের স্নিগ্ধ মধুর হাসি থেকে শুরু করে কল্যাণ হস্তের সেবার মধ্যে কোথায় যেন কৃত্রিমতা আছে। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল। প্রতিদিনের কর্তব্যকর্ম যন্ত্রের মতো তারা করে যায়, মুখের হাসিটুকুও মনে হয় সেই যান্ত্রিকতারই অংশ। তবে একটা বিষয়ে এদের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। যে কোনো যাত্রীর মুখের ভাব দেখেই এরা বুঝতে পারে—কে অসুস্থ বোধ করছে, কে মৃত্যুভয়ে ভীত, কে নার্ভাস। সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক অবস্থাকে দুশ্চিন্তা থেকে অন্য খাতে ফেরাবার জন্য মুহুর্মুহু এটা-ওটা-সেটা সামনে এনে ধরে! তাতেও যদি সে স্বাভাবিক স্তরে এসে না পৌঁছয়, তাহলে বরফজল আর অডিকোলনে সিক্ত ফেস্‌-টাওয়েল দেবে মুখে কপালে ঘাড়ে বোলাবার জন্যে। এ-ছাড়া মিঠে ও কড়া নানাবিধ উত্তেজক পানীয় তো আছেই।

পূর্ণযৌবনা সুঠামদেহী যে এয়ার-হোস্টেসটির কথা আমি বলছি, সে বার বার ফিরে ফিরে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে।

বিমানযাত্রায় সাধারণত পাশাপাশি যাত্রী ভিন্ন দেশীয় হলেও ভাষার অসুবিধা না থাকলে দু-চারটে প্রশ্নোত্তর থেকে আলাপ জমে ওঠে। অথচ আমরা দুই ভারত-সন্তান ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাশাপাশি বসে আছি, কারোর মুখে কোনো কথা নেই। ইতিমধ্যে দু'ঘণ্টা পার হয়ে গেছে, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কায়রো বিমান-বন্দরে আমাদের কিছুক্ষণের জন্য অবতরণ করতে হবে।

আমাদের গোমড়ামুখো নীরবতা দেখে এয়ার-হোস্টেস নিজেও বোধহয় অস্বস্তি বোধ করছিল। করাই স্বাভাবিক। শারীরিক অসুস্থ না হয়ে পড়লে কোনো যাত্রীকে মনমরা দেখলে এয়ার-হোস্টেসরা মনে করে, এটা যেন তাদেরই কর্তব্যের ত্রুটি। যাত্রীদের হাসিখুশি রাখাটাই তো এদের কাজ। দু'ঘণ্টা পার হয়ে গেল অথচ আমরা দু'জনে রামগরুড়ের ছানা হয়ে বসে আছি। এয়ার-হোস্টেসটি বোধহয় এ-দৃশ্য আর সহ্য করতে না পেরে, প্যাসেজের ধারে আমার সীট, তাই আমাকে এসে কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করল—'তোমাদের কি কিছু প্রয়োজন আছে?'

আমি ততোধিক মোলায়েম কণ্ঠে বললাম—'আপাতত কিছু আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

মেয়েটির বুদ্ধি প্রখর। বুঝতে পারল, আমি ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যাচ্ছি। এবার সে স্মিতহাস্যে বললে—

'কোল্ড ড্রিংকস্?'

'নো কোল্ড ড্রিংকস্।'

'হট কফি?'

'নো কফি।'

'কোল্ড বিয়ার?'

'নো বিয়ার।'

'স্কচ হুইস্কি?'

'নো হুইস্কি।'

'জার্মান শ্যামপেন?'

এবারেও যথারীতি 'নো শ্যামপেন বলতে যাব, হঠাৎ পাশে থেকে সন্তোষবাবু বলে উঠলেন—'আর তো সহ্য করা যায় না সাগরবাবু; দোহাই আপনার, দয়া করে 'হ্যাঁ' বলে ফেলুন আর বলে দিন যেন দুটো গেলাস দেয়।'

দমবন্ধ আবহাওয়ার মধ্যে এতক্ষণ বসেছিলাম, এবার যেন খানিকটা মুক্ত হাওয়া এসে আমাদের মনের গুমোট দূর করে দিল। আমার সম্মতির অপেক্ষা না করেই মেয়েটি ছুটে স্টোর-রুম থেকে শ্যামপেনের একটি ছোট্ট বোতল আর দুটি গ্লাস ট্রেতে সাজিয়ে আমাদের দিয়ে গেল, মুখে তৃপ্তির হাসি। বোতল থেকে শ্যামপেন দুটি গ্লাসে সমপরিমাণে ঢেলে দেবার সময় বললে —'আশা করি, এবার তোমাদের যাত্রা আনন্দের হবে।'

"ডাঙ্কেশ্যেন ফ্রলাইন।" ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বললাম। খুশির মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে দিয়ে মেয়েটি "বিটেশ্যেন" বলে বিদায় নিল। সেই মুহূর্তেই সন্তোষবাবু গেলাসটা শূন্যে তুলে ধরলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমিও। ঠোকাঠুকি হল।

'চিয়ার্স।'

'চিয়ার্স।'

ন্যানসির আত্মাহুতি

যে ভ্রমণ-পথের কথা লিখব বলে এ-কাহিনী শুরু করেছিলাম, কথায় কথায় সে-পথ ছেড়ে অনেকদূর সরে এসেছি। আবার স্বস্থানে ফেরা যাক। ভারতবর্ষের আকারের তুলনায় তিনগুণ বড় মার্কিনদেশে আমাকে ১৯৬৭ সালে একেবারে নিঃসঙ্গ একাকী ছ'মাস ভ্রমণ করতে হয়েছে একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত। এই ভ্রমণের সবটাই আমার পক্ষে অবিমিশ্র আনন্দের না হলেও দেশ ভ্রমণে আমার নাবালকত্ব দশা যে কিছুটা ঘুচেছে, সেটুকুই আমার লাভ। তথাপি প্রতি মুহূর্তেই মনে হতো, সন্তোষ ঘোষ যদি আমার সঙ্গে থাকতেন। বিদেশ বিভুঁইয়ে নিঃসঙ্গ ভ্রমণে মানসিক অবসাদ অনেক সময় শরীরের উপরেও তার প্রভাব বিস্তার করে। তার পরিণাম খুবই মারাত্মক। তখন যেখানেই যাই, সে-স্থান যত মনোরমই হোক, মনের উপর কোনো স্থায়ী ছাপ রাখে না। ক্যামেরার চোখ দিয়ে একটার পর একটা দৃশ্যের ছবি তোলা হয়ে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু মনের ফিলম্ যে তখন ধোঁয়াটে হয়ে আছে, ছবি উঠবে কেন! তিন মাস পর স্মৃতির ভাণ্ডার মন্থন করতে গিয়ে দেখি ও-দেশের অনেক ঘটনাই হারিয়ে গেছে, অনেক দৃশ্যই ভাসা-ভাসা ছাপ রেখেছে। তারি মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে আমেরিকার পুব ও পশ্চিম প্রান্তের দুটি ঘটনা, যা সবিস্তারে আমি এখানে বলতে চাই।

যে সময়ে আমি নিউইয়র্ক গিয়ে পৌঁছেছি সে সময়টাকে মার্কিনবাসীরা বলে 'সামার সীজন'। মে-জুন-জুলাই—এই

তিনটি মাস দেশ-বিদেশের ভ্রমণকারীদের কাছে আদর্শ সময় এবং মার্কিনদেশের সবগুলি বড় বড় শহরের মধ্যে নিউইয়র্ক জাঁক-জমক সাজসজ্জায় আমোদ-প্রমোদে জমজমাট। ভ্রমণকারীদের তীর্থস্থান এই শহরে স্বদেশ ও বিদেশের মানুষদের আকর্ষণ করবার নানাবিধ উপচার সাজিয়ে রেখেছে। জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়ায় আমি যখন নিউইয়র্কে এসে পৌঁছেছি তখন সবেমাত্র আরব-ইজরাইল যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়েছে। ইউনাইটেড নেশন্স-এ তখন চলেছে ঘোর তর্ক-বিতর্ক। নিউইয়র্ক শহরের শতকরা ৩০ জন মার্কিনী হচ্ছে ইহুদি, এবং বহু অর্থবান ও প্রতিষ্ঠাবান ধনপতি হচ্ছে ইহুদি বংশের সন্তান। সুতরাং যুদ্ধে আরব-ইজরাইল সংঘর্ষে আরবের পরাজয় ও ইজরাইলের জয় যেন রাশিয়ার পরাজয় ও আমেরিকার জয়। অন্তত নিউইয়র্কের রাস্তাঘাটে আলোচনায়, সংবাদপত্রের শিরোনাম ও মন্তব্যে, কফিখানার আড্ডায়, পানশালার বিতর্কে এই রকমই মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ইজরাইলের যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে আরো জোরদার করে তুলবার জন্যে লক্ষ লক্ষ ডলার চাঁদা উঠল রাতারাতি। নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ইজরাইল সাহায্য-রজনী। হলিউডের জনপ্রিয় শিল্পীরা নাচ গান ও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবেন, পত্রিকায় পূর্ণ পৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপনে অনুষ্ঠানসূচী ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সব টিকিট নিঃশেষ হয়ে গেল চড়া দামে।

এত উত্তেজনার মধ্যেও উৎসবমুখর নিউইয়র্কের দিন আর রাত সর্বদাই ভ্রমণকারীদের জন্য আমোদ-প্রমোদের সহস্র উপকরণ সর্বত্র ছড়িয়ে রেখেছে। মার্কিনীদের মুখেই শুনছি, নিউইয়র্ক নাকি সদাজাগ্রত শহর, কখনো সে ঘুমোয় না। বিশেষ করে মানহাটান আর ব্রডওয়ে অঞ্চলের রেস্তোরাঁ আর পানশালা আগন্তুকদের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা উন্মুক্ত। যত রাত বাড়ে খরিদ্দারের

ভিড় ততই জমজমাট। মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে সাইরেনের মতো হুঁশিয়ারী আওয়াজ তুলে পুলিসের গাড়ি পাড়া সচকিত করে ছুটে যায়, কোথাও কোনো নাইট ক্লাব বা পানশালার উন্মত্ত জনতার উপদ্রবকে শান্ত করবার জন্যে।

শুধু মার্কিন দেশেরই নয়, সারা পৃথিবীর সাংস্কৃতিক পীঠস্থান এই নিউইয়র্ক শহর। বোধহয় এই কারণেই আজ নিউইয়র্ককে বলা হয় ইন্টারন্যাশনাল সিটি। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্যারিসের যে গৌরব ছিল, তার অনেকটা হরণ করেছে নিউ ইয়র্ক। সেকালে দেশ-বিদেশের ভ্রমণকারীদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ ছিল—'সী প্যারিস অ্যাণ্ড ডাই।' অর্থাৎ মৃত্যুর আগে প্যারিস দেখে নাও, আফসোস থাকবে না। একালের প্রবাদ হচ্ছে—'মাস্ট্ সী নিউইয়র্ক বিফোর ইউ ডাই।' মৃত্যুর আগে অন্তত নিউইয়র্ক দেখে নেওয়া অবশ্যই চাই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে শিল্পীর দল এই সময়ে নিউইয়র্কে আসেন তাঁদের শিল্পকীর্তির পসার নিয়ে। আমি যখন নিউইয়র্কে উপস্থিত তখন পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলছে লণ্ডনের রয়্যাল ব্যালের নৃত্যানুষ্ঠান, যার টিকিট সম্পূর্ণ বিক্রি হয়ে গিয়েছে তিন মাস আগেই। মেক্সিকো থেকে এসেছে লোকনৃত্যের শিল্পীর দল। রাশিয়া থেকে বলশই থিয়েটারের ব্যালে দল আসবে, তাদের টিকিট নিয়ে মার্কিনীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি। পরে জানতে পেরেছিলাম, বলশয় থিয়েটারের দল আর আসেনি; আরব-ইজরাইল সংঘর্ষজনিত রাজনৈতিক ঘটনাই হয়তো তার অন্যতম কারণ। ইওরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে চিত্রকররা এসেছেন তাঁদের চিত্রকলা নিয়ে। প্রদর্শনী শহরের সর্বত্র। এই শহরে যদি শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকীর্তির যোগ্য মর্যাদা পান তাহলে সারা মার্কিনদেশেই শুধু নয়, ইওরোপেও তাঁদের খ্যাতি ও যশ বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া মার্কিনী দর্শকদের মন যদি জয় করা যায়

তাহলে মৌখিক উৎসাহই শুধু নয়, আর্থিক উৎসাহেও শিল্পীরা লাভবান হন। পণ্ডিত রবিশঙ্করের কথাই ধরা যাক। নিউইয়র্কের পত্র-পত্রিকায় রবিশঙ্করের সচিত্র সাক্ষাৎকার, তাঁর সংগীত পরিবেশনার অবিমিশ্র প্রশংসাসূচক সমালোচনা একাধিকবার বিভিন্ন পত্রিকায় আমি দেখেছি। আমেরিকান লাইফ ম্যাগাজিন-এ রবিশঙ্করের উপর সচিত্র প্রবন্ধ দেখে আমার ধারণা, আমেরিকার দৃষ্টিতে রবিশঙ্কর আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সম্মান লাভ করেছেন। শুধু তাই নয়, ওদেশে একাধিক কলারসিককে বলতে শুনেছি, রবিশঙ্কর আজ ওয়ার্লড্স্ গ্রেটেস্ট মিউজিশিয়ান। আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ভ্রমণ করে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র সেতার ও তবলা, রবিশঙ্কর ও আল্লারাখার বিপুল জনপ্রিয়তার পরিচয় আমি পেয়েছি।

এতক্ষণ নিউইয়র্কের উজ্জ্বলতম অংশের কথাই বললাম, এবার বলব এই চোখ-ধাঁধানো মহানগরীর আরেকটি অঞ্চলের কথা—যা গ্রীনিচ ভিলেজ নামে পরিচিত। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন এই অঞ্চলকে শহর না বলে শহরতলিই বলা সঙ্গত। এখানে কখনো স্কাই-স্ক্র্যাপার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি, বুলডোজারের দাপটে এখানকার ম্যাকডুগাল অ্যালে, প্যাচিন প্লেস এবং কর্মাস স্ট্রীটের কানা গলি ও সরু রাস্তার মাধুর্য আজও ধ্বংস হয়নি। নিউইয়র্কের প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে গ্রীনিচ ভিলেজ আজও বেঁচে আছে। এ অঞ্চলে প্রবেশ করলে মনে হয় যেন কলকাতার কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা ও নবাগন্তুকদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, আপন আপন বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে যে-কোনো ধর্মের মানুষ এখানে আপন মনে বাস করতে পারে। নিজের বিশ্বাস, ধর্ম, খেয়ালখুশি নিয়ে জীবন-যাপনের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে এখানে। বোধহয় এই কারণেই এই ভিলেজ প্রাণপ্রাচুর্যে এত মুখর, সৃষ্টির

উন্মাদনায় এত চঞ্চল। একঘেয়ে জীবনের বাঁধা রাস্তায় এখানকার মানুষ চলে না, সর্বদা নূতনত্বের আস্বাদ নিয়ে সে প্রাণবন্ত থাকতে চায়। সাহিত্যিকদের কাছে গ্রীনিচ ভিজেল প্রেরণার উৎসস্থল—যে কারণে টমাস পেইন, হেনরী জেমস, হেরমান মেলভিল, এডগার অ্যালেন পো, মার্ক টোয়েন এবং ডিয়োডোর ড্রেসার প্রমুখ মার্কিন লেখকবৃন্দ তাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ এই ভিলেজেই কাটিয়েছেন। আধুনিক যুগের প্রখ্যাত বৃটিশ কবি ডিলান টমাস গ্রীনিচ ভিলেজকে মনেপ্রাণে ভালোবেসেছিলেন, এখানেরই এক হোটেলে অপরিণত বয়সেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বর্তমানে আছেন ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার অনুগামী মার্কিনী কবি অ্যালেন গীনসবার্গ। গীনসবার্গের প্রভাব আজ আমেরিকা ছাপিয়ে ইওয়োপে সুবিস্তৃত, বিশেষ করে তাঁর কাব্যদর্শন ও জীবনদর্শনের প্রতি তরুণদলের দুর্মর আকর্ষণ তাঁকে প্রায় গুরুর আসনে বসিয়েছে। গীনসবার্গের কবিতার বই 'হাউল' প্রায় লক্ষাধিক কপি বিক্রি হয়েছে এবং তাঁর কবিতার আবৃত্তির গ্রামোফোন রেকর্ড তাঁর বইয়ের চেয়ে কম জনপ্রিয় নয়। আমেরিকা ও ইওরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় গীনসবার্গের ডাক আসে বক্তৃতা দেবার জন্যে। বর্তমানে তাঁর বক্তৃতার ফী ৭০০ ডলার।

গীনসবার্গের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কলকাতায়। তার আগে ওদেশের পত্র-পত্রিকায় বীট কবিদের গুরু অ্যালেন গীনসবার্গ সম্পর্কে পড়া ছিল। চার বছর আগে দেশ পত্রিকার দপ্তরেই এখানকার জন দশ-বারো তরুণ কবির সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিল ওঁর একধারে সখা, সচিব ও প্রিয় শিষ্য পিটার ওরলভস্কি, সে-ও কবি।

এক শনিবার দুপুরে পিটার এসে আমাকে নিয়ে গেল তাদের গ্রীনিচ ভিলেজের আস্তানায়। বেলা তখন দুটো। রাস্তা

দিয়ে যেতে যেতে দেখি, ফুটপাথের দুপাশে দেওয়াল ও রেলিংয়ের গায়ে চিত্র প্রদর্শনী চলছে। প্রতি বছর সামার-সীজনে এখানে উন্মুক্ত পথের দুধারে দেশ-বিদেশের শিল্পীদের চিত্র প্রদর্শনী হয়। এবারে সবসমেত ৮০০ শিল্পী যোগ দিয়েছে। এদের মধ্যে আমেরিকান শিল্পীর সংখ্যাই বেশী। অনেকে এসেছে সিঙ্গাপুর ম্যানিলা কোরিয়া অথবা জাপান থেকে। ছবিগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়, প্রত্যেক শিল্পীর অঙ্কনরীতি ও বিষয়বস্তুর পার্থক্য তাঁর দেশের পরিচয় বহন করছে। দর্শকদের ভিড়ও কম নয়। একেক জন শিল্পীর কুড়ি-পঁচিশখানা ছবি একটা পুরোনো বাড়ির দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো, শিল্পী নিজে এক কোণে একটি কাঠের চেয়ারে চুপচাপ বসে আছেন। পায়ে হেঁটে ছবি দেখতে দেখতে ওয়াশিংটন স্কোয়ারের কাছাকাছি এসে পড়েছি। নেড়া পার্ক, সবুজ ঘাস প্রায় নেই বললেই হয়। অনেকটা আমাদের শ্রদ্ধানন্দ বা দেশবন্ধু পার্কের মতোই দেখতে। পার্কের মাঝখানে একটি বিরাট গাছ ডালপালা বিস্তার করে ছায়া সিঞ্চন করছে। গাছের তলায় কিছু জনতার ভিড়, সেখান থেকে ভেসে আসছে সমবেত কণ্ঠের গান। দূর থেকে মনে হল, চেনা সুর যেন শুনতে পাচ্ছি। বহু তরুণ-তরুণী আর নিগ্রোদের ভিড় ঠেলে ভিতরে উঁকি মেরে যা দেখলাম ও শুনলাম তা ছিল আমার কল্পনার অতীত। গাছের তলায় জন দশ-বারো সাদা মার্কিনী ছেলে, বয়স তাদের বাইশ-তেইশের বেশী নয়, বিশুদ্ধ সুরে ও উচ্চারণে নাম-সংকীর্তন করছে। ছেলেদের সকলেই মুণ্ডিতমস্তক, গায়ে হলুদ-রঙে ছোপানো গেঞ্জি, পরনেও হলুদ রঙের ধুতি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। ঊর্ধ্ববাহু হয়ে তারা নেচে নেচে গাইছে :

হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ

কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

শুধু এই চারটি লাইন গেয়ে চলেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শনিবার সকাল এগারোটায় শুরু হয়েছে এই গান, বিরামহীন এই নাম-সংকীর্তন শেষ হবে সোমবার সকাল এগারোটায়। একজনের কাঁধে একটি ছোট সিঙ্গল রীডের পেটি হারমোনিয়াম, কাঁধের উপর দিয়ে সাদা কাপড়ে গিঁট বেঁধে সেটি ঝোলানো। দু'জনের হাতে খঞ্জনি, ছন্দ রেখে টুং টুং করে বাজিয়ে চলেছে, আরেকজন বাজাচ্ছে একটি ঢোলক। খোল বাজানো বোধহয় এখনো রপ্ত করে উঠতে পারেনি। গানের দলে জন ছয়েক তরুণীও আছে। তারা গানের ছন্দে ছন্দে মৃদু হস্ত সঞ্চালন করে নৃত্যভঙ্গিমার চেষ্টা করছিল। গাছের তলায় একটি ইজেলের উপর বৃহদাকারের একটি রঙিন বাংলার পট, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়ার পথে শিষ্যদের নিয়ে দুই হাত তুলে নগর-সংকীর্তন করতে করতে চলেছেন। ছবিটির তলায় রোমান হরপে বড় বড় করে লেখা আছে সেই চারটি লাইন যা তারা সমস্বরে গাইছে। বহু দর্শক ও শ্রোতা—তাদের মধ্যে আমেরিকান নিগ্রোও আছে, তারাও এই ভক্ত মার্কিনী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গানটি অনুসরণের চেষ্টা করে চলেছে।

এই দৃশ্য আমাকে যখন বিস্ময়ে বিমূঢ় করে তুলেছে, পিটার তখন কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল—'যা দেখছো এটা কিন্তু হুজুগের ব্যাপার নয়। আজকের দিনের মার্কিনী তরুণ-তরুণীদের মনে তাদের সমাজের প্রতি একটা তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এ তারই প্রতিক্রিয়া।'

অবাক হয়ে আমি বললাম—'কেন? অসন্তোষের কারণ কি?'

'অ্যাফ্লুয়েন্স সোসাইটির বিরুদ্ধে এটাই এদের বিদ্রোহ।'

খুবই গম্ভীর হয়ে পিটার আরো বললে—'জানো, এতকাল ধ
এদেশের ছেলেমেয়েদের সামনে লিন্‌কনের জীবনকে আদর্শরূপে তুলে ধরে বলা হয়ে আসছে—লগ কেবিন টু হোয়াইট হাউস। অর্থাৎ টাকা টাকা আর টাকা। টাকা হলেই ক্ষমতা, যশ, প্রতিপত্তি, সম্মান। না থাকলে সমাজের চোখে তুমি করুণার পাত্র।'

পিটারের কথাটা আপাত সত্যি হলেও কেমন যেন বেমানান মনে হচ্ছিল। আমি বললাম—'তোমাদের দেশের মানুষরা পরিশ্রমী! পরিশ্রমের তো একটা ফল আছেই, সেই ফল আজ সে ভোগ করছে। এতে প্রতিবাদ করার কী অর্থ?'

পিটার হেসে বললে—'আমাদের দেশ যুদ্ধ বাধাতে পারে, আবার দুটো অ্যাটম বোমা ফেলে যুদ্ধ থামাতেও পারে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। পৃথিবীর মানুষকে এ-ছাড়া আর কিছু দিতে পেরেছে কি? চাল গম দিয়ে পেটের খোরাক মেটাতে পারে, মনের খোরাক নয়।'

আমি উত্তরে হেসে বললাম—'ও ভারটা আমাদের দেশের উপরই ছেড়ে দাও। তুমি বলছিলে 'লগ কেবিন টু হোয়াইট হাউস' তোমাদের মোটো, আর আমাদের হচ্ছে প্রাসাদ ছেড়ে দীনতম কুটিরে চলে যাওয়া; তাই তো রাজপুত্র সিদ্ধার্থ রাজৈশ্বর্য ও বিলাস ছেড়ে ছিন্ন বাস পরে গেলেন অরণ্যে।'

পিটার উৎফুল্ল হয়ে বললে—'এইজন্যই তো আমরা ইণ্ডিয়ার কাছে কৃতজ্ঞ। তোমাদের বুদ্ধ চৈতন্য রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী বিষয়সর্বস্ব পার্থিব জগতের অনেক নীচতা দীনতা হীনতা থেকে তোমাদের মন ও চিন্তাকে মুক্ত রেখেছে। আমাদের দেশের তরুণরাও কিছু কিছু তার আস্বাদ পেতে চাইছে বলেই এরা আজ নাম-সংকীর্তন নিয়ে মেতে উঠেছে।'

পিটারের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এতকাল জেনে এসেছি, প্রাচুর্যের দেশ আমেরিকা তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিলাস

বৈভবের জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ঈর্ষার কারণ। কিন্তু এ-দেশে এ-যুগের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও যন্ত্রণা আছে, অতৃপ্তি আছে, অশান্তি আছে। শুধু তাই নয়, এ থেকে তারা আজ মুক্তির পথ খুঁজছে ভারতবর্ষের কাছেই!

এদিকে গাইয়েদের ঘিরে দর্শকদের ভিড় ক্রমশই বাড়ছে। আগেই বলেছি, এই সময়ে নিউইয়র্কে ভ্রমণকারীদের সমাগমের সময়। গ্রীনিচ ভিজেল পরিদর্শনে ভ্রমণকারীদের আকর্ষণের প্রধান কারণ হল, এ-অঞ্চলের মানুষরা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। আপ রুচি খানা, আপ রুচি পরনা—কেউ বাধা দেবে না। এখানে নিজের খেয়াল-খুশি মাফিক জীবনযাপনে প্রত্যেকেরই অবাধ স্বাধীনতা। তুমি আমীর হও বা ফকির, এদের কাছে তোমার মূল্য সমান। সুতরাং ওয়াশিংটন পার্কের এই গাছতলায় বিদেশীরা দলে দলে নাম-সংকীর্তনকারীদের ছবি ক্যামেরা আর মুভীতে ধরে রাখতে ব্যস্ত। যারা গাইছে তারা কিন্তু নির্বিকার। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সেই পটের দিকে অচঞ্চল দৃষ্টি রেখে দুই হাত তুলে নেচে নেচে তারা গেয়েই চলেছে। জুন মাসের গরম। দরবিগলিত ঘাম ঝরছে ওদের গা বেয়ে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তন্ময় হয়ে ওরা গাইছে—হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।

নিউইয়র্কে এসে গ্রীনিচ ভিলেজের এই অভিজ্ঞতাকে মার্কিনীদের হুজুগের একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেই হয়তো আমি উপেক্ষা করতাম, কিন্তু তা সম্ভব হল না ঠিক এক মাস পরে আমেরিকার একেবারে পশ্চিম প্রান্তে লস এঞ্জেলেস্-এর আরেকটি মর্মন্তুদ ঘটনায়।

জুলাই মাসের তিন তারিখে এসেছি লস এঞ্জেলেস্-এ। থাকব মাত্র পাঁচ দিন। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে যাবতীয় দ্রষ্টব্য দেখে নেবার জন্যে ঘোরাঘুরির অন্ত নেই। ৬ই জুলাই সকালে স্থানীয় সংবাদপত্র 'লস এঞ্জেলেস্ টাইমস্' পত্রিকার প্রথম

পাতায় রামকৃষ্ণদেব ও তাঁর পাশে এক সুন্দরী মার্কিনী তরুণীর ফটোগ্রাফ দেখে চমকে উঠলাম। ছবির পাশে বড় বড় অক্ষরে শিরোনামা—

Chances Reported poor
Human Torch Fights for life

এর তলায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা পড়ে আমি স্তম্ভিত। সংবাদটি হচ্ছে :

হলিউড অঞ্চলসংলগ্ন চিত্রতারকাদের বাসস্থান যে পাহাড় অঞ্চল ঘিরে, তাকে বলা হয় বেভারলি হিলস্। এটি ধনীদের পাড়া। এই পাড়ারই একটি সুন্দরী তরুণী নিজের গাত্রবস্ত্রে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। ডাক্তারেরা বলছেন মেয়েটির বাঁচবার আশা খুবই কম।

নাম ন্যানসি লুইস মূর, বয়স চব্বিশ। শরীরের ৯০ ভাগ দগ্ধ অবস্থায় তাকে জেনারেল হাসপাতালে আনা হয়েছে।

পিতা জন মূর নর্থ আমেরিকান এভিয়েশনের পদস্থ অফিসার। খবর পেয়ে ছুটে এসেছিলেন হাসপাতালে কিন্তু কন্যার তখনো চৈতন্য ফিরে আসেনি।

ন্যানসির বাবা পুলিসের কাছে এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, এই কয়েকদিন আগেই তিনি বেভারলি হিলস্-এর পুলিস বিভাগে তাঁর কন্যার নিরুদ্দেশের কথা জানিয়ে বলেছিলেন যে, কুমারী মেয়েটি মানসিক অস্থিরতায় ভুগছিল এবং ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিল।

দুর্ঘটনার আগের দিন সকাল সাড়ে আটটায় কুমারী ন্যানসি বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে নিরুদ্দেশ হয়। দু'ঘণ্টা পরে মেয়ের নিরুদ্দেশের সংবাদ পেয়েই মিঃ মূর বেভারলি হিলসের পুলিস বিভাগে রিপোর্ট করেন।

পুলিসের কাছে মিঃ মূরের বিবৃতিতে জানা যায়, ন্যানসি

লম্বায় ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি, দেহের ওজন ১৪৫ পাউণ্ড। মাথার চুল সোনালী, চোখের তারা নীল এবং পরনে কালো স্কার্ট ও সোনালী ব্লাউজ। পিতার অনুমান, ন্যানসি সানফ্রান্‌সিসকো যাবার উদ্দেশ্যেই ঘর ছেড়ে পালিয়েছে।

কিন্তু সেদিনই দুপুর দেড়টায় ন্যানসি লস এঞ্জেলেস্‌-এর ডেরমণ্ট রোড-এর একটি মোটরগাড়ির সার্ভিস স্টেশনে এসে উপস্থিত। সময়টা লাঞ্চ খাবার, সাধারণত লোকজনের আনা-গোনা সে-সময় কমই থাকে। ন্যানসি নিঃশব্দে পেট্রল পাম্প থেকে হোস পাইপটা তুলে নিজের স্কার্ট ও ব্লাউজ পেট্রলে ভিজিয়ে নিল। পাম্পের কাছে এসে ন্যানসি এমন একটা কাণ্ড করেছে তা কারোর নজরে পড়েনি।

সার্ভিস স্টেশনেব একটি ছোকরা তখন কাচের ঘরের ভিতরে বসে টিফিন খাচ্ছিল। নাম তার রিসার্ড কোলম্যান, বয়েস ত্রিশেরও কম। পুলিসের কাছে সে বলে যে, হঠাৎ দেখতে পায় মেয়েটি ক্যাশিয়ারের বুথের কাছে এগিয়ে এসে একটা দেশলাই জ্বেলে আগুনটা বুকের কাছে ধরা মাত্র সে আগুন ছড়িয়ে পড়ল মেয়েটির সর্বাঙ্গে। চিৎকার করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো কোলম্যান, ফায়ার এক্সটিংগুইশার নিয়ে যখন সে ছুটে এসেছে তখন আগুন ন্যানসিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে। শুধু দেখতে পেল ন্যানসির বাঁ হাতে ধরা আছে এক শ্মশ্রুমণ্ডিত পুরুষের ফটোগ্রাফ, সেই ছবির প্রতি তখনো মেয়েটির ধ্যাননিমগ্ন দৃষ্টি আবদ্ধ। ছবিটি সম্বন্ধে পুলিসের ব্যাখ্যা হচ্ছে, ইনিই হচ্ছেন হিপিদের আধ্যাত্মিক গুরু।

এই সংবাদটি যেমন মর্মান্তিক, তেমনই বিস্ময়কর। আমি দেখে অবাক হলাম যে, শ্মশ্রুমণ্ডিত পুরুষের ছবিটি রামকৃষ্ণদেবের, কিন্তু সংবাদের রিপোর্টার তাঁর রিপোর্টে কোথাও রামকৃষ্ণদেবের নাম উল্লেখ করেনি। ছবির পরিচয়ে শুধু বলা হয়েছে—হিপিদের

ভারতীয় আধ্যাত্মিক গুরু। পত্রিকায় ছবি ছাপা হয়েছে, কিন্তু তার ক্যাপশনেও রামকৃষ্ণদেবের নামের উল্লেখ নাই।

পরদিন লস এঞ্জেলেস্ ছেড়ে আমি চলে যাই সানফ্রান্-সিসকোয়। সেখানে পথে-ঘাটে অগণিত 'হিপি'দের দেখেছি সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। সংসার-বিবাগী তরুণ-তরুণী উন্মুক্ত আকাশের নীচে আলো ও বাতাসের সঙ্গে মুক্ত প্রেমের টানে ঘরছাড়া। শুনেছি লক্ষাধিক আমেরিকান বিবাগী ছেলেমেয়ে তখন সানফ্রান্-সিসকোয় সমবেত হয়েছে। সম্পন্ন ও প্রতিষ্ঠাবান একাধিক সাদা আমেরিকানকে আক্ষেপ করে বলতে শুনেছি, নিগ্রো-সমস্যাকে ওরা বড় সমস্যা বলে মনে করে না। আজ ওদের চিন্তিত করে তুলেছে 'হিপি' ও 'বীট' সম্প্রদায় বলে যে নতুন জেনারেশন দেখা দিয়েছে তারাই। এরাই হচ্ছে আমেরিকার ভবিষ্যৎ বংশধর। আজ অর্থে সামর্থ্যে প্রাচুর্যে গড়া এই আমেরিকাকে এরা কোন্ ভরসায় এই উত্তরাধিকারীদের হাতে ছেড়ে দেবে—যাদের টাকার প্রতি মোহ নেই, বিলাস ঐশ্বর্যে ঘৃণা, পিতামাতার সম্পত্তির প্রতি নেই কোনো লোভ। এরা সেই অগণিত সিদ্ধার্থের দল যারা আজ ভোগ ঐশ্বর্য বিলাসের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মনের অস্থিরতা ও যন্ত্রণা জুড়োবার জন্যে সানফ্রান্-সিসকোর পথে পথে দীনদরিদ্র বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ন্যানসি চেয়েছিল, সে নিজে মশাল হয়ে জ্বলে উঠবে মোহান্ধকারে পথভ্রষ্ট দেশবাসীকে পথের সন্ধান দেবার জন্যে। সেইজন্যেই বোধহয় রামকৃষ্ণদেবের ছবির দিকে ধ্যাননিমগ্ন দৃষ্টি রেখে দেশলাইয়ের আগুন সে বুকের কাছে ছুঁইয়েছিল।

ন্যানসিকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ন্যানসি 'মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।'

লম্বোদরের তিন ছেলে

জীবনে ভোম্বলদার মত বিচিত্র চরিত্রের মানুষ আরও দেখেছি, এবং এ-ও দেখেছি, প্রত্যেক মানুষের জীবনই নাটকীয় উপাদানে ভরা। কমেডি আর ট্রাজেডির টানাপোড়েনে বোনা মানব-জীবন যেন নক্সী-কাঁথার এক-একটি বিচিত্র ডিজাইন, কোন এক অদৃশ্য শিল্পী সবার অলক্ষ্যে থেকে আপন মনে এঁকে চলেছেন।

আমার কৈশোর জীবনে দেখা যে চার-চরিত্রের কথা আমি এখন বলতে বসেছি, তারা হচ্ছে লম্বোদরের বংশধর।

পুব বাংলার চাঁদপুর মহকুমার মধ্যে বাজাপ্তি গ্রামে ছিল আমার পৈতৃক ভিটা। আমাদের পাশের গ্রামের লম্বোদর ভট্টাচার্য ছিলেন সে-তল্লাটে নামকরা ভোজনবিলাসী ব্রাহ্মণ পুরোহিত, তাঁর ভোজনপর্ব সম্পর্কে আমাদের গ্রামে মজার মজার কাহিনী প্রচলিত, তারই একটি আজ আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি।

লম্বোদর ভট্টাচার্য যখন বুঝতে পারলেন, তাঁর শেষ সময় উপস্থিত তিন ছেলেকে কাছে ডাকলেন।

বড় ছেলে স্ফীতোদর, মেজো বৃকোদর আর কনিষ্ঠ পুত্র কৃশোদর মৃত্যুশয্যায় শায়িত পিতার শয্যাপাশে এসে বসল।

মৃত্যুপথযাত্রী লম্বোদর দুর্বল ক্ষীণ কণ্ঠে ছেলেদের বললেন— আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। যাবার আগে তোমাদের কাছে একটি মাত্র অনুরোধ, লোকে যেন বলে পিতার উপযুক্ত সন্তান তোমরা, বাপের নাম রেখেছো। তাহলেই পরলোকে আমার আত্মা শান্তি পাবে।

লম্বোদরের তিন পুত্রই পিতার এই উপদেশ নতমস্তকে শিরোধার্য করে নিল, নিশ্চিন্ত হয়ে লম্বোদর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

লম্বোদর ভটচাজকে আমি আমার বাল্যকালে একাধিকবার দেখেছি এবং আমাদের গ্রাম থেকে পুবে পাঁচ মাইল দূরে চালতা-তলির বৈদিক বাড়ির এই স্বনামধন্য ব্রাহ্মণ ছিলেন আমাদের বিশেষ কৌতুক ও কৌতূহলের বস্তু।

শৈশবে আমরা যখন পুজোর ছুটি ও গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে যেতাম, তখন আমার বৃদ্ধা ঠাকুরমার হাত ধরে পাঁচ মাইল হেঁটে একবার এই চালতাতলির বৈদিক বাড়িতে যেতে হতো, ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ লম্বোদরের পাদোদক পান করে দীর্ঘায়ু হবার জন্যে। ঠাকুরমা একবাটি জল লম্বোদরের পায়ের কাছে ধরতেন, খড়ম থেকে আলগোছে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলে সেই বাটির জলে ছুঁয়ে দিতেন। সেই জল ভক্তিভরে আমাদের মাথায় ছিটিয়ে দিতেন ঠাকুরমা, পরে বাকি জলটুকু আমাদের খেয়ে ফেলতে হতো।

সেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের কাছে দু'টাকা প্রণামী রেখে ঠাকুরমা আবার আমাদের সেই পাঁচ মাইল পথ হাঁটিয়ে গ্রামে ফিরে আসতেন।

লম্বোদর ভটচাজ সম্পর্কে আমার কৌতূহল ছিল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-স্পর্শিত পাদোদক সেবনের জন্য নয়, এরকম সার্থকনামা উদরসর্বস্ব ব্রাহ্মণ আমার জীবনে দ্বিতীয় আর কাউকে দেখিনি।

আমাদের গ্রামে পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মাদিতে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাতে হলেই লম্বোদর ভটচাজকে বলতেই হতো এবং তিনি যখন তাঁর তিন শিশুপুত্রদের সঙ্গে নিয়ে ভোজনে বসতেন তখন তা দেখবার জন্যে গ্রামবাসীদের মধ্যে ভিড় লেগে যেত।

আমার কৌতূহল ছিল ঠিক এই কারণেই। ছেলেবেলায় কলকাতার ফুটপাথে মাদারীদের জাদুবিদ্যা দেখে আমরা বিস্মিত হতাম। অনায়াসে একটার পর একটা লোহার গুলি খেয়ে ফেলে

আবার তা বার করে যখন দেখাত তখন তাজ্জব বনে যেতাম. হাততালির ধুম পড়ে যেত দর্শকদের মধ্যে। লম্বোদরের খাওয়াটাও ছিল ঠিক এই ধরনের এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এক হাঁড়ি রসগোল্লা একটার পর একটা টপাটপ খেয়ে ফেলতেন, নিমেষে হাঁড়ি শেষ। বলাই বাহুল্য, জাদুকরের লোহার বল-এর মতো রসগোল্লা তাঁকে আর বের করতে হতো না।

ছেলে তিনটিও তৈরী হয়েছিল চৌকশ। বাপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারাও হাত চালাত। বাপ একাই একটা হাঁড়ি শেষ করতেন, ওরা তিনজনে শেষ করত একটা। বড় ছেলে স্ফীতোদর ছিল আরো এককাঠি সরেস। রসগোল্লা শেষ হয়ে গেলে দুই হাতে হাঁড়িটা মুখের কাছে ধরে চোঁচোঁ করে রসগোল্লার সবটুকু রস খেয়ে ছোট্ট একটা ঢেকুর তুলত।

হাঁড়ির পর হাঁড়ি দই মিষ্টি সাবাড় করে ব্রাহ্মণীর জন্য ছাঁদা বাঁধতেন। তিন ছেলের মাথায় তিনটি ছাঁদা চাপিয়ে নির্বিকার-চিত্তে হাঁটা দিতেন নিজের গ্রাম চালতাতলির পথে।

আমাদের গ্রামের জমিদার দত্তরা ছিল দুই শরিক। বড় আর ছোট বাড়ির মধ্যে সর্বদাই রেষারেষি চলত। দুর্গাপূজার সময় কোন বাড়ির প্রতিমা ভালো হয়েছে, কোন বাড়ির যাত্রার দল এবার আসর মাৎ করেছে, কোন বাড়ির পূজায় প্রজাদের ভিড় সবচেয়ে বেশি—এই নিয়ে দুই শরিকে প্রতি বছরই বচসা শুরু হতো এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই বচসার নিষ্পত্তি হতো উভয় পক্ষের লাঠিয়ালদের মোকাবিলায়।

সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামে গিয়েই শুনি বড় বাড়ির জমিদারের মাতৃবিয়োগ হয়েছে, দিন সাতেক পরেই পারলৌকিক ক্রিয়া উপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজন হবে। সে-তল্লাটের বাইশটা গ্রামের ব্রাহ্মণরা আসছেন, আর আসছেন চালতাতলির বৈদিক বাড়ির লম্বোদর ভটচাজ, সঙ্গে তাঁর তিন ছেলে—স্ফীতোদর, বৃকোদর ও কৃশোদর।

এখানে বলে রাখা ভাল যে, লম্বোদরের ছোট ছেলের নামকরণের একটি ছোট্টো ইতিহাস আছে। জন্মাবার পর থেকেই লম্বোদরের কনিষ্ঠ পুত্র একটু পেট-রোগা ছিল। বেশী খেতে পারত না, খেলেও হজম হতো না; রাগ করে তাই বাপ নাম রাখলেন কৃশোদর। কনিষ্ঠ পুত্র সাবালক হয়ে উঠলেও তার নাম পরিবর্তনের কোনো কারণ ঘটেনি। তার দুই অগ্রজের মতো আহারে পারঙ্গম হতে না পারলেও বাপের সুনাম রক্ষার চেষ্টা সাধ্যমতো সে বরাবরই করে এসেছে।

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে। লম্বোদর তাঁর তিন পুত্র নিয়ে বড় বাড়ির ব্রাহ্মণভোজনে আসছেন এবং খাবেন আজব খাওয়া ভোজ কয় যাহারে।

বাইশটা গ্রামের লোক ভেঙে পড়ল সেদিন জমিদার বাড়ির আটচালায়। সন্ধ্যাবেলায় লোকে লোকারণ্য। ব্রাহ্মণভোজন তো নয়, যেন যাত্রার আসর। আটচালার মাঝখানে তিন চারটে হ্যাজাক জ্বলছে, তারি তলায় পাত পড়েছে ব্রাহ্মণভোজনের। আসরের চারদিক ঘিরে আবাল-বৃদ্ধ নরনারী ভিড় করে দাঁড়িয়ে। ব্রাহ্মণরা একে একে আসরে এসে বসতে লাগলেন, কিন্তু লম্বোদরের দেখা নেই। আমরা উৎসুক হয়ে লম্বোদরের অপেক্ষা করছি, ওদিকে পাতে বসে পড়া ব্রাহ্মণরা অপেক্ষা করছেন লুচির ধামা হাতে নিয়ে কখন পরিবেশকের দল আসরে নামবে।

লম্বোদর কি তাহলে আসেননি? আমরা হতাশ হয়ে পড়লাম। ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বললে—এসেছেন, তবে বিশ্রাম নিচ্ছেন। তিনদিন উপোসে থেকে দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছেন, তাই ক্লান্ত।

এমন সময় লম্বোদর তাঁর তিন পুত্রকে নিয়ে আসরে প্রবেশ করলেন এবং নিজেদের নির্দিষ্ট জায়গায় বসতে না বসতেই চালতা-

তলির লোকেরা হর্ষধ্বনি দিয়ে বললে—ভটচাজ মশাই, গ্রামের নাম রাখা চাই।

লম্বোদর পাশে উপবিষ্ট তিন ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন—শুনলি তো! গ্রামের নাম আমি ঠিকই রাখব, বাপের নাম তোদের রাখা চাই।

শুরু হল খাওয়া। এতো খাওয়া নয়, যেন ভাগাড়ে শকুন পড়েছে। নিমেষের মধ্যে ধামা ধামা লুচি, বেগুনভাজা, মাছের মুড়োর ডাল, মাছের ঝোল, মাংস নিঃশেষ হতে লাগল। পাত চেটেপুটে পরিষ্কার করেই হাঁকডাক শুরু—কই, লুচি কই, মাছের তরকারী কই, বেগুনভাজা কই—

পরিবেশনকারীরা গলদ্ঘর্ম হয়ে ছুটোছুটি করছে, জমিদারবাবু স্বয়ং আসরে দাঁড়িয়ে তদারক করছেন। চারদিকে গোল হয়ে ভিড় করে দাঁড়ানো দর্শকের দল যে-যার গ্রামের ব্রাহ্মণদের চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছে।

এবারে ভোজনপর্বের শেষের দিক। দই মিষ্টি পরিবেশন শুরু হয়েছে। লম্বোদরের কাছে আসতেই তিনি পরিবেশনকারীকে শুধু বললেন—কেন বার বার কষ্ট করবেন, তার চেয়ে তিন হাঁড়ি দই আর তিন হাঁড়ি মিষ্টি আমাদের সামনে বসিয়ে দিয়ে যান। তাতে আপনাদেরও পরিশ্রম বাঁচবে, আমাদেরও হাঁকডাক করে আপনাদের বিরক্ত করতে হবে না।

জমিদারবাবু তৎক্ষণাৎ সেই ব্যবস্থাই করলেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণদের তখন পেট ফাটো-ফাটো অবস্থা, উঠতে পারলে বাঁচে। আটচালার মণ্ডপে ফরাস পাতা আছে, যাতে ব্রাহ্মণরা আহারান্তে কোনো রকমে গড়িয়ে গড়িয়ে এসেই শুয়ে পড়তে পারে।

লম্বোদর ততক্ষণে দইয়ের হাঁড়িটা শেষ করে একটা মিষ্টির হাঁড়ি পাতের উপর টেনে নিলেন। শুধু একবার বললেন—

গোটা কতক লেবু আর কাঁচালঙ্কা দিন, মাঝে মাঝে মুখটা মেরে নিতে হবে।

বশংবদ তিন বংশধরও বাপের সঙ্গে সমান তাল রেখে খেয়ে চলেছে। কনিষ্ঠ পুত্র কৃশোদর হাত চালাচ্ছে বটে, তবে দাদাদের মতো অতটা পটুত্বের সঙ্গে নয়। লম্বোদর একবার কৃশোদর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে চাপাস্বরে রেগে বললেন—কুলাঙ্গার।

আসরের অন্যান্য ব্রাহ্মণরা ভোজনান্তে অনুমতি নিয়ে কোনোরকমে মণ্ডপের ফরাস বিছানো শয্যায় পেট ভাসিয়ে শুয়ে পড়েছে, লম্বোদর ও তাঁর তিন পুত্র তখনো হাঁড়ির মিষ্টি শেষ করতে ব্যস্ত।

হাঁড়ির শেষ রসগোল্লাটা মুখে পুরেই লম্বোদর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোদের হল? এইবার উঠে পড়।

জ্যেষ্ঠপুত্র স্ফীতোদর তখন রসগোল্লার হাঁড়িটা দুই হাতে মুখের কাছে ধরে রসটা খেতে ব্যস্ত। উপযুক্ত পুত্রের কাণ্ডটা দেখে লম্বোদরের মুখে একটা পরিতৃপ্তির ভাব। মনে মনে তিনি বুঝে গেলেন, এই ছেলেই তাঁর নাম রাখবে। রসিকতা করে বললেন—দেখিস, পাঁপরভাজা দেয়নি বলে রাগ করে হাঁড়িটা কড়মড় করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলিস না।

আহারান্তে বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করলেন না লম্বোদর ভটচাজ। তিন ছেলের মাথায় ব্রাহ্মণীর জন্য ছাঁদা চাপিয়ে গ্রামে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

বড়বাবু জমিদার করজোড়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—ভটচাজ মশাই, বেশ তৃপ্তি করেই খেয়েছেন তো?

লম্বোদর বললেন—ব্রাহ্মণদের আহারে কি কখনো তৃপ্তি আছে? কিছু অতৃপ্তি নিয়েই ফিরতে হয়। তবে আয়োজনের কোনো ত্রুটিই আপনি রাখেননি। আপনার মায়ের আত্মার কল্যাণ হোক।

লম্বোদর তাঁর তিন পুত্রকে নিয়ে যাত্রা করলেন গ্রামের পথে। চালতাতলি গ্রামের দর্শকদল হর্ষোৎফুল্লচিত্তে সঙ্গে সঙ্গে চলল। যেন কোনো প্রতিযোগিতামূলক খেলায় শীল্ড জিতে নিয়েছেন লম্বোদর, উল্লাসধ্বনি সহকারে সঙ্গে চলেছে সমর্থকের দল।

সেই খাওয়াই লম্বোদরের শেষ খাওয়া। গ্রামে তিনি সুস্থ ভাবেই ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু এসে সেই যে শয্যা নিলেন, আর উঠলেন না। তিন পুত্রকে কাছে ডেকে তাঁর সুনাম রক্ষার গুরুদায়িত্ব ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তিনি চক্ষু মুদলেন।

ইতিমধ্যে অনেক বৎসর পার হয়ে গিয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশ দ্বিখণ্ডিত হল, সেই থেকে আমাদেরও আর স্বগ্রামে যাবার সুযোগ ঘটেনি। কৈশোর জীবনে গ্রামের বহু স্মৃতির সঙ্গে লম্বোদর ভটচাজের কথা আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। কিন্তু তাঁর তিন পুত্র পিতার সুনাম কীভাবে রক্ষা করছেন জানবার অসীম কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও গ্রামের সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচে যাওয়ায় চালতাতলির এই ব্রাহ্মণ পরিবারের কোনো খবর আর রাখতে পারিনি।

বছরখানেক আগে আমার এক পিসতুতো ভাই এসেছিল কলকাতায়। উদ্দেশ্য ছিল, শহরতলির কোথাও একটু জমি সংগ্রহ করে বাড়ি তুলবেন। দেশের গ্রামে আর থাকা নিরাপদ নয়, কোনো রকমে একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁই করতে পারলেই সবাইকে নিয়ে আসবেন।

আমার সঙ্গে দেখা হতেই কথায় কথায় গ্রামের কথা উঠল, সেই প্রসঙ্গে চালতাতলির বৈদিক বাড়ির লম্বোদর ভটচাজের বংশধর তিন ভাইয়ের কথাও। পিতৃ-আজ্ঞা পালন করার পরিণাম শুনে আমি স্তম্ভিত। সেই ঘটনাই এবার আপনাদের বলি।

লম্বোদরের তিরোধানের পর তাঁর তিন পুত্র স্ফীতোদর, বৃকোদর ও কৃশোদরের দিন খুবই কষ্টে চলছিল। দেশ ভাগ হয়ে গিয়েছে; সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। হিন্দু জমিদাররা প্রায় সবাই পাকিস্তান ছেড়ে হিন্দুস্থানে চলে এসেছে। যে দু-চারজন আছে, তাদের আর সেই বোলবোলাও নেই। যে-কয় ঘর গৃহস্থ হিন্দু পরিবার নিতান্তই পৈতৃক ভিটার টানে মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে, তারা নিজেদের প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত। ঘটা করে পূজাপার্বণ পারলৌকিক ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান আর সম্পন্ন করা তাদের সামর্থ্যেও কুলোয় না, মানসিক অবস্থাও অনুকূল নয়। সুতরাং ব্রাহ্মণভোজনের রেওয়াজ প্রায় উঠেই গিয়েছে। শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান তিলাঞ্জলি তর্পণ করেই সমাধা করতে হয়। বাপের নাম রাখবার জন্যে তিনভাই ব্যাকুল, কিন্তু সে সুযোগ তাদের ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটে।

ইতিমধ্যে যুগটাও গিয়েছে পালটে। শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়া-কর্মাদিতে একালের তরুণদের মতি নেই—তারা মনে করে ওটা বাজে খরচ।

স্ফীতোদর তার দুই ভাই বৃকোদর ও কৃশোদরকে বললে—দেখ, এখানে পড়ে থেকে আর কি হবে। যজমানরা তো প্রায় সবাই এদেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে গিয়েছে। ক্রিয়াকর্মাদিতে আমাদের তো আর কেউ ডাকে না, ডাকলেও রীতিরক্ষার্থে নমো নমো করে সেরে দেয়। তার চেয়ে চল আমরাও চলে যাই।

বৃকোদর দাদার প্রস্তাবে প্রতিবাদ জানিয়ে বললে—তা কেমন করে হয়। এখনও তো কয়েক ঘর হিন্দু গ্রামে আছে। আমরা চলে গেলে তাদের চলবে কি করে।

ছোট ভাই কৃশোদর বললে—তাছাড়া কলকাতায় আমাদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই। এখানে তবু তো পৈতৃক ভিটেটা আছে। ওখানে শুনেছি, চাল ডাল তেল ঘি সব কিছুতেই

ভেজাল। ভেজালের দেশে গিয়ে অম্লরোগে প্রাণটা দেওয়ার চাইতে এখানে শাক ভাত অনেক ভালো। অবস্থার একটু উন্নতি হলে যজমানরা সবাই আবার নিজের নিজের গ্রামে ফিরে আসবে, ওরা ফিরলে আমাদেরও কপাল ফিরবে।

ছোট ভাই কৃশোদরের কথাটা স্ফীতোদর ও বৃকোদর ফেলতে পারল না বটে, তবে ওদের কপাল আর ফিরবার লক্ষণ নেই।

অবশেষে সত্যিই একদিন কপাল ফিরল। ভৌমিকবাড়ির বড় কর্তা দেহরক্ষা করলেন। অবস্থাপন্ন কায়স্থ পরিবার, ছেলেরা বৃদ্ধ পিতাকে অনেকবার বলেছিল, এ-দেশ ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে থাকতে, বৃদ্ধ কিছুতেই রাজী হননি। যে-ভিটেতে জন্মেছেন সেই ভিটেতেই দেহরক্ষা করলেন এবং এইটিই ছিল তাঁর একমাত্র সংকল্প। ছেলেরা তাই স্থির করল ঘটা করে পিতৃশ্রাদ্ধ করবে।

সে-তল্লাটে কতগুলি হিন্দু গ্রাম ছিল। সেই সব গ্রামের অবশিষ্ট ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে ব্রাহ্মণভোজনের, সেই সঙ্গে নিমন্ত্রণ হয়েছে চালতাতলির ভটচাজ বাড়ির তিন বংশধরের।

স্ফীতোদর, বৃকোদর ও কৃশোদর এমনিতে প্রায় অর্ধাশনেই দিন কাটাচ্ছিল, এবারে ব্রাহ্মণভোজনের সাত দিন আগে থেকে পুরো অনশনে থেকে গেল। বহুকাল পর পিতৃনাম রক্ষার সুযোগ পেয়েছে তিন ভাই। তাদের সংকল্প, দশ গাঁয়ের লোক যেন একবাক্যে বলতে পারে—হ্যাঁ, লম্বোদরের উপযুক্ত বংশধর বটে।

ভোজনের দিন প্রাতঃকালে স্নান সেরে পূজার্চনাদি সমাধানের পর কপালে চন্দনের ফোঁটা কেটে নতুন ধুতি ও চাদর পরে ছাঁদা বাঁধবার জন্য তিনজনে তিনটি নতুন গামছা মাথায় চাপিয়ে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করল।

ভৌমিকবাড়ি চালতাতলি থেকে মাইল আষ্টেক হাঁটা পথ। এবারে গ্রামবাসীরা ব্রাহ্মণভোজন দেখবার জন্যে সঙ্গে কেউ আর

গেল না। তারা জানে, এটা নিতান্তই অভাবের দিনের ভোজন; এখানে রেষারেষি করে, প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে কোনো ব্রাহ্মণই ভোজন করতে যাচ্ছেন না। সুতরাং খাওয়া দেখে উৎফুল্ল হওয়ার ব্যাপারই এটা নয়।

গ্রামের সীমান্ত পর্যন্ত এসে গ্রামবাসীরা তিন ভাইকে বিদায় দিয়ে বললে—তোমরা লম্বোদর ভট্টাচার্যের উপযুক্ত বংশধর, পিতার অন্তিম বাসনা তোমরা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবে। তাছাড়া চালতাতলি গ্রামের সুনামও তোমরা রেখে আসবে আশা করি।

স্থির হল, ব্রাহ্মণভোজন যখন দ্বিপ্রহরে তখন সূর্যাস্তের আগেই তিন ভাই ফিরে আসবে, গ্রামবাসীরা গ্রামের সীমান্তে ওদেরই প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় থাকবে।

দুপুর পেরিয়ে বিকেল হল। সূর্য তখন প্রায় পশ্চিমপ্রান্তে হেলে পড়েছে। গ্রামের পুব প্রান্তের বড় বকুল গাছের তলায় গ্রামবাসীরা দল বেঁধে আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছে তিন ভাইয়ের প্রত্যাবর্তনের। কারোর দেখা নেই।

সূর্য যখন প্রায় ডোবে-ডোবে তখন সহসা দেখা গেল দূর থেকে একজন অতিকষ্টে হেঁটে আসছে। মুখটা আকাশের দিকে তোলা, পথের উপর দৃষ্টি ফেলবার উপায় নেই। একটা অর্ধচেতন দেহ কোনোরকমে থপ্‌থপ্‌ করে হেঁটে এগিয়ে আসছে। গ্রাম-বাসীরা ছুটলো সেদিকে। এ নিশ্চয় তিন ভাইয়ের এক ভাই। কাছে গিয়ে দেখলে, ছোট ভাই কৃশোদর। আকণ্ঠ এমন খাওয়াই খেয়েছে যে মাথাটা নিচু করতে পারছে না, আকাশের দিকে মুখ রেখেই সে হাঁটছে।

কৃশোদরকে তার দুই দাদা স্ফীতোদর ও বৃকোদরের কথা জিজ্ঞাসা করতেই সে কোনো রকমে হাতের ইসারায় পিছনের পথটা দেখিয়ে দিলে, কথা বলবার মতো শক্তিও তখন তার নেই।

গ্রামবাসীরা বুঝে নিল যে, পিছনে আর দুই ভাই আসছে।

ছোট ভাইয়ের অবস্থাই যখন এই, তখন অপর দুই ভাইকে কী অবস্থায় দেখবে সেই কৌতূহল নিয়েই গ্রামবাসীরা এগিয়ে চলল। মাইলখানেক পথ যাওয়ার পর দেখতে পেল জন সাত-আট লোক একটা খাটিয়া কাঁধে বয়ে নিয়ে আসছে।

কাছে আসতেই দেখা গেল সে আর কেউ নয়, মেজোভাই বৃকোদর প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় খাটিয়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে, ভৌমিকবাড়ির কয়েকজন ষণ্ডামার্কা পাল্‌কি-বেহারা তাকে বহন করে নিয়ে আসছে।

চিৎকার করে গ্রামবাসীরা জিজ্ঞেস করল বড়ভাই স্ফীতোদরের কথা। সে কোথায়!

বৃকোদরের মুখেও কোনো কথা নেই। সে শুধু অতি কষ্টে ডান হাতটা আকাশের দিকে তুলে আঙুল দেখিয়ে পথের নির্দেশ দিল। অর্থাৎ পরলোকে গেলেই দেখতে পাবে।

উৎকণ্ঠা নিয়ে আরো খানিকটা পথ এগিয়ে যাবার পর গ্রামবাসীরা দেখতে পেল, একটা বটগাছের তলায় ফাঁকা জমিতে একটা চিতা জ্বলছে, চিতার ধোঁয়ায় আকাশ অন্ধকার। সূর্যও তখন অস্তাচলে।

দাশরথির পাঁচালী

আমার এই লেখার শিরোনাম দেখে আঁৎকে উঠবেন না। ভয় নেই, বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের কোনো বিষয় নিয়ে গবেষণামূলক ভারি প্রবন্ধ আমি লিখতে বসিনি। থীসিস লিখে ডকটরেট পাবার জন্য দাশু রায়ের পাঁচালী সম্পর্কে নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গিতে কোনো গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি জানি সে-রকম কিছু বাসনা থাকলে আপনারা আমাকে বরদাস্ত করতেন না, সম্পাদক মহাশয়ও একই কারণে আমাকে সবিনয়ে এড়িয়ে চলতেন।

আমার এই লেখার প্রধান নায়ক দাশরথি, তারই পাঁচালী আপনাদের শোনাবো। তবে এ দাশরথি সে দাশরথি নয়—যাঁর পাঁচালী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রসের প্লাবন বইয়ে দিয়েছিল। আমি যে দাশরথির কথা বলতে বসেছি সে ছিল আমার কৈশোর জীবনে শান্তিনিকেতন স্কুলে সতীর্থ।

আমার জীবনে বহু সাহিত্যিকের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশবার ও জানবার সৌভাগ্য ঘটেছে, তারই কিছু ঘরোয়া কাহিনী আমি 'সম্পাদকের বৈঠকে' গ্রন্থে বলেছি। আরও অনেক কাহিনী অলিখিত থেকে গিয়েছে, এবারে তারই একজনকে নিয়ে আমার কৈশোর জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলছি।

আমার ছেলেবেলার কথা বলতে গেলে আজ থেকে ৫৫ বছর পূর্বের শান্তিনিকেতনে ফিরে যেতে হয়। তখন শান্তিনিকেতন ছিল যথার্থই আশ্রম, দিগন্তবিস্তারী প্রান্তরের প্রান্তে কিছু শাল ছাতিম ও দেবদারু গাছ, তারই মাঝে এ-পাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত

ছড়ানো খড়ের চালা বাড়ি। তখন শান্তিনিকেতনের না ছিল আজকের মতো প্রাসাদোপম অট্টালিকার ঐশ্বর্য, না ছিল সরকারী দাক্ষিণ্যের এমন ঢালাও ব্যবস্থা। কিন্তু আশ্রমের প্রাণ ছিল আনন্দে ভরপুর। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই আশ্রমের প্রাণপুরুষ। আমি যে-সময়ের কথা বলছি, তখন রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি পূর্বে ও পশ্চিমে সমান ভাস্বর। আশ্রমের নানাবিধ ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে তাঁর সক্রিয় যোগ ছিল, কর্মী রবীন্দ্রনাথ থেকে শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে বড়বেশি আলাদা করে দেখার সুযোগ আমাদের শৈশবে আমরা পাইনি। অত্যন্ত কর্মব্যস্ত মানুষ কিন্তু কখনই তা আমাদের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বা ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারেনি। প্রতিদিন সকালে তিনি আমাদের ক্লাসে এসে শারীরতত্ত্ব পড়িয়েছেন গল্পের আকারে। বিজ্ঞানের বিষয় উদাহরণ আর উপমার সাহায্যে সহজ ও সরল করে দিতেন তিনি। কোনোদিন অনুবাদের ক্লাস নিতেন, ইংরেজি থেকে বাংলায়, বাংলা থেকে ইংরেজিতে। আবার কোনোদিন শেলীর স্কাইলার্ক কবিতাটি পড়ে শুনিয়ে আমরা কে কিভাবে কবিতার মর্মে প্রবেশ করেছি, আমাদের প্রশ্ন করে জেনে নিতেন, তারপর তিনি নিজে কী ভাবে কবিতাটি গ্রহণ করেছেন তা প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করতেন। তাঁর কবিতা-পাঠের ক্লাসে ছিল ছোটো-বড়ো সব শিক্ষার্থীর প্রবেশাধিকার। এমনকি অধ্যাপকরাও ছাত্র হয়ে আমাদের পাশেই বসে যেতেন। এরই মধ্যে আরেক দিকে চলছে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির কাজ। গান রচনা করে সুর দিয়ে ছেলেমেয়েদের শেখাচ্ছেন, দুপুরে ছবি এঁকে চলেছেন আপন মনে, সন্ধ্যাবেলা নতুন রচিত নাটকের মহড়া শুরু হল। এর উপরে আছে প্রতিদিন দেশ-বিদেশের বহু দর্শনার্থীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। সকাল থেকে বিকেল ছিল তাঁর নানাবিধ কাজের ফিরিস্তিতে ঠাসা, বিরাম বলে তাঁর কিছু ছিল না। একমাত্র সন্ধ্যাবেলায় তিনি

লেখাপড়ার কাজ কিছুই করতেন না—সেই সময়টুকুই ছিল তাঁর চিত্তবিনোদনের একমাত্র সময়। গান, নাটকাভিনয়, ছেলেদের সাহিত্য-সভায় যোগদান। যেদিন এ-সব কিছু থাকত না উত্তরায়ণের বারান্দায় আসর জমিয়ে তিনি বসতেন, উপস্থিত থাকতেন পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু প্রভৃতি অধ্যাপক মণ্ডলী। তাঁদের সঙ্গে আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আরেক মানুষ। রসালাপের মধ্য দিয়ে নানা দুরূহ বিষয় নিয়ে চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা মনোজ্ঞ আলোচনা।

রবীন্দ্র-চরিতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য আমি সেই ছেলেবেলা থেকেই লক্ষ্য করেছিলাম। তিনি এক বাড়িতে একনাগাড়ে বেশিদিন থাকা পছন্দ করতেন না।

শান্তিনিকেতনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন তখন সেই ফাঁকা প্রান্তরে মাত্র দুটি পাকা ইমারত নির্মিত হয়। একটি উপাসনাগৃহ, কাঁচের মন্দির। অপরটি তারি সন্নিকটে প্রাসাদোপম দোতলা বাড়ি, পরবর্তীকালে যা অতিথিশালারূপে ব্যবহৃত হত।

ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ যখন সপরিবারে শিলাইদহ থেকে শান্তিনিকেতনে এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করলেন তখন সেই প্রাচীন অতিথিশালার দ্বিতলে তিনি থাকতেন। কিন্তু এক জায়গায় কিছুদিন থাকার পরই তিনি হাঁপিয়ে উঠতেন—হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনো খানে তাঁর ডেরা বদল করতেই হবে। চলে এলেন আশ্রমের পুব প্রান্তে দেহলী নামে ছোট্টো দ্বিতল ঘরের দোতলার একখানি সংকীর্ণ পরিধির ঘরে। আসবাবের মধ্যে শুধু একটি খাট আর জলচৌকী। ওখানে কিছুকাল থাকার পর পশ্চিম প্রান্তে নতুন একটি বাড়ি তৈরি করলেন। সিমেন্টের মেজে, ইঁটের দেওয়াল, খড়ের চাল।

সেখানে কয়েক বৎসর মাত্র থাকার পর এবারে চলে এলেন উত্তরায়ণ চৌহদ্দির মধ্যে ওড়িষ্যার মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী অনুকরণে নির্মিত গৃহে, যার নাম দিলেন 'কোনার্ক'। তারপরে যখন পুত্র রথীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় ভারতীয় স্থাপত্যকলা অনুসরণে নির্মিত হল 'উদয়ন', তখন সেখানে চলে এলেন বেশ কয়েক বছরের জন্যে। কিন্তু প্রাসাদপুরীর মতো এই বিরাট বাসগৃহে আর তাঁর মন বসছিল না। স্থির করলেন এবার তিনি থাকবেন মাটির কাছাকাছি, একেবারে মাটির ঘরে। যে-বাড়ির মেজে, দেয়াল, ছাত সবই হবে মাটি দিয়ে তৈরি। তাঁরই নির্দেশে নির্মিত হল 'শ্যামলী'। ছোট্ট মাটির ঘর, নড়তে চড়তে এ দেয়ালে ও দেয়ালে ঠোকাঠুকি খেতে হয়। দীর্ঘদেহী রবীন্দ্রনাথের মাথা প্রায় মাটির ছাত ছুঁই-ছুঁই। এত অসুবিধা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ শ্যামলীর কোঠা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে অনিচ্ছুক। এই 'শ্যামলী' ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বাসগৃহ। এর প্রতি তাঁর যে কীরকম মায়া পড়ে গিয়েছিল তার দুটি উদাহরণ তুলে ধরছি। ১৯৩৯ সাল। আমি তখন কলকাতায় আছি, 'দেশ' পত্রিকায় তখনো যোগ দিইনি। যুগান্তরের তখন আমি নাকি একজন উঠতি সাব-এডিটর।

শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসবে আমি প্রতি বছর যাই যতখানি না উৎসবের টানে, তার চেয়ে বেশি স্বজন পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষায়। ও সময়টা আমার কাছে ফ্যামিলি রি-ইউনিয়নের উৎসব। কিন্তু দোল-উৎসবের টান আমার কাছে সর্বাধিক। শান্তিনিকেতনের আকাশ-বাতাস, শালবীথিকা, আম্রকুঞ্জ, খোয়াই আর কোপাই নদী—এরাও আমার স্বজন, এরাও আমার আত্মীয়। পূর্ণিমার চাঁদ, বসন্তের গান আর শালমঞ্জরীর সঙ্গে আমার পুনর্মিলন ঘটে এই দোল উৎসবেই। সেই সঙ্গে থাকে আরেকটি কর্তব্য, উৎসবপতি রবীন্দ্রনাথকে একবার প্রণাম করে আসা।

যথারীতি উৎসবের পরের দিন শ্যামলীতে গিয়েছি রবীন্দ্র-দর্শনে। আমরা পুরোনো ছাত্র, তাঁর কাছে আমাদের চিরদিনই ছিল অবারিত দ্বার। সোজা শ্যামলীতে ঢুকে দেখি ঘরে কোথাও তিনি নেই। ভৃত্য বনমালী একটা ঝাড়ন নিয়ে এঘর-ওঘর করছে। জিজ্ঞেস করতেই বনমালী বললে—

'বাবুমশাই বাগানে বসে লিখছেন।'

শুনে থমকে গেলাম। এসময় কি ওঁর কাছে যাওয়া উচিত! এখন ত আর আমি শিশুবিভাগের ছেলে নই যে, যখন তখন 'কথা ও কাহিনী' বইটা নিয়ে গিয়ে বলব, 'গুরুদেব, আজ সাহিত্য সভায় আমাকে 'পণরক্ষা' কবিতাটি আবৃত্তি করতে হবে। কি ভাবে বলব একটু দেখিয়ে দিন।'

ছেলেবেলায় এরকম উৎপাত নিঃসঙ্কোচে আমরা ওঁর উপর অনবরতই করে এসেছি। কিন্তু এখন তো আর সেই ছেলেবেলার ছেলেমানুষ আমি আর নই, হঠাৎ গিয়ে বিরক্ত করতে সঙ্কোচ বোধ হওয়াই স্বাভাবিক। যাব কি যাব না এই ভাবনা নিয়ে ইতস্তত করছি, বনমালী বললে—'যান না, ঐ তো গাছতলায় বসে লিখছেন। আপনার আবার ডর কিসের।'

সত্যিই তো, আমাদের গুরুদেবের কাছে যাব—এতে ডর কিসের! সোজা চলে গেলাম উত্তর দিকের আম বাগানে। একটি অনতিউচ্চ গাছের ছায়ায় ছোট একটি টেবিলে ঝুঁকে বসে একাগ্র চিত্তে লিখছেন, মনে হল কোনো একটা প্রবন্ধ। পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, টের পেলেন না। লেখায় তখনো তন্ময়। হঠাৎ নজরে পড়ল রবীন্দ্রনাথের সামনে, চার-পাঁচ হাত দূরে, একটা ছোট্ট আমগাছের ডালে বিরাট এক মৌচাক। মৌমাছি-গুলি আকারে বেশ বড়ো, ঘন ঘন উড়ে যাচ্ছে আবার এসে বসছে। স্তব্ধ বিস্ময়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছি—মনের মধ্যে আশঙ্কা ঘনিয়ে উঠছে।

একটা পরিচ্ছেদের শেষ লাইনটা লিখে মুখ তুলে মৌচাকটার দিকে তাকাতেই আমি পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম।

আমাকে দেখেই দুই বিস্ফারিত চোখে বিস্ময় ঢেলে বললেন—'আরে, তুই এসেছিস ? কবে এলি ? আর তোর তো সাহস কম নয়। আমার দারোয়ান, পাইক পেয়াদাদের ভয় না করে সোজা আমার কাছে চলে এসেছিস !'

আমি ততোধিক বিস্মিত কণ্ঠে বললাম—'এতো বড় একটা মৌচাক সামনে রেখে আপনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা লিখছেন, আপনার ভয় করে না ?'

হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কৌতুকভরা কণ্ঠে বললেন—'মানুষের চেয়ে এরা আমার প্রতি অনেক ভদ্র আচরণ করে থাকে। এরা কখনো আমাকে উৎপাত করে না।'

অনুমান করলাম কলকাতা থেকে দোলের ছুটিতে শান্তিনিকেতন বেড়াতে যারা আসে তাদের উৎপাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে এই বাগানে এই মৌমাছি রাজত্বে আশ্রয় নেওয়া।

আমি বললাম—'সামনে কড়া পাহারাদার রেখেও কি আপনি রেহাই পাচ্ছেন ?'

রবীন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে বললেন—'কোথায় আর পাচ্ছি। এই যেমন তুই। তোরা কি আর মৌমাছি দেখে ভয় পাস ? ওরাই বরঞ্চ তোদের ভয়ে পালাবার পথ খোঁজে। তবে হ্যাঁ, কলকাতার বাবুরা যখন আসে আমার নীলমণি (ভৃত্য বনমালীকে সবসময় আদর করে এই নামেই ডাকতেন) মৌচাকটা দেখিয়ে দেয়। তাতেই কাজ হয়, আর এই সীমানায় পা দেয় না।'

কথা বলতে বলতে কলমটা তুলে নিয়ে আবার লেখার কাগজের উপর ঝুঁকে পড়লেন, আমিও নিঃশব্দে প্রণাম করে চলে এলাম।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রিয় বাসগৃহ শ্যামলাকেও ছেড়ে আসতে হল একদিন। বর্ষাকালের এক রাত্রে প্রবল বর্ষণের পর দেখা গেল ছাতের মাটি ভিজে চাপ চাপ কাদা ধসে পড়ছে। তারপর থেকে সে বাড়ি ছেড়ে উঠে গেলেন পাশেই একটা একতলা পাকা বাড়িতে, যার নাম 'প্রাচী'। স্বল্প কয়েক মাস প্রাচীতে থাকার পর তাঁর শেষ জীবনের আশ্রয়স্থল নির্মিত হল 'উদিচী'। ছোট দোতলা পাকা বাড়ি। একতলায় থাকবে তাঁর পরিচারক ভৃত্য বনমালী, দোতলায় একটিমাত্র ছোট আকারের ঘর। যে-ঘরে একটি খাট ও ছোট টেবিল চেয়ার ছাড়া আসবাবের কোনো বাহুল্য নেই। দক্ষিণে একটি প্রশস্ত ঢাকা বারান্দা, সেখানে একটি আরাম কেদারা আছে। প্রত্যূষে সূর্যোদয় ও সায়ংকালে সূর্যাস্ত দেখা ছিল তাঁর শেষ জীবনের প্রাত্যহিক ক্রিয়া।

একদিন অপরাহ্ণে উদয়নের বারান্দায় সূর্যাস্তের দিকে মুখ করে রবীন্দ্রনাথ স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন, চোখ দুটি নিমীলিত। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন প্রতিদিন অপরাহ্ণে ভ্রমণের পর ঘরে ফেরার পথে কুশল প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে যেতেন। সে-সময় রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছিল না। যেদিন ভালো বোধ করতেন ক্ষিতিমোহনবাবুকে ডেকে বসিয়ে গল্পগুজবে মেতে উঠতেন আর যেদিন শরীর ও মন প্রতিকূল থাকত সেদিন কুশল প্রশ্ন করলে শুধু বলতেন—'মোহানায় এসেছি এবার সমুদ্রে বিলীন হলেই হয়।'

এ-কথার পর ক্ষিতিমোহনবাবু বুঝে নিতেন যে আজ শরীর সুস্থ বোধ করছেন না—প্রণাম করেই চলে যেতেন।

এই রকমই আরেকদিন অপরাহ্ণে কবি-প্রণাম করতে এসে দেখেন রবীন্দ্রনাথ বারান্দায় আরামকেদারায় স্তব্ধ হয়ে চোখ বুজে বসে আছেন, কোনো সাড়া শব্দ নেই। অনুমান করলেন

বোধহয় ঘুমুচ্ছেন, সুতরাং আর বিরক্ত করা নয়। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এসে আলগোছা চটি জুতোজোড়া ছুঁয়ে প্রণাম করে সিঁড়ির কাছ পর্যন্ত ফিরে যেতেই রবীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন—'সে কী ক্ষিতিমোহনবাবু, আজ যে বড় পালাচ্ছেন?'

ক্ষিতিবাবু অপ্রস্তুত। সলজ্জভাবে বললেন—'তা নয়। মনে হল আপনি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন তাই বিরক্ত করতে চাইনি।'

সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ছড়া কেটে বললেন :

'প্রণাম করিতে এল
দুই চোখ রাখি মেলে
জুতোজোড়া পাছে যায় চুরি।'

বলাই বাহুল্য এর পরে ক্ষিতিমোহনবাবু একটি মোড়া টেনে এনে রবীন্দ্রনাথের পাশে বসে জমিয়ে গল্প শুরু করে দিলেন।

.

আমি কিন্তু দাশরথির পাঁচালী শোনাবো বলেই আসরে নেমেছিলাম। পাঁচালী গাইবার আগে গুরুবন্দনা করার একটা রীতি আছে, এতক্ষণ সেইটুকুই শুনিয়েছি। আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি যদি ঘটে থাকে মার্জনা চাই। এবার শুরু করব মূল কাহিনী।

আমার কৈশোর জীবনে শান্তিনিকেতন স্কুলে সতীর্থ দাশরথিকে নিয়েই আমার এই কাহিনী। মেদিনীপুরের এক জমিদার বংশের ছেলে দাশরথি। পুত্রের মধ্যে পিতা কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পেয়ে কবিগুরুর আশ্রমে ভর্তি করাই সাব্যস্ত করলেন, যাতে যোগ্য গুরুর সান্নিধ্যে এসে দাশরথির কবিত্বশক্তি বর্ষাকালীন দামোদরে মতো দুকূলপ্লাবী হতে পারে।

দাশরথি এসে ভর্তি হল আমাদের ক্লাসেই। প্রথম প্রথম আমরা দাশরথিকে এড়িয়ে চলতাম। বড়লোক জমিদার তনয়,

তার সাজপোশাকের কৌলিন্য, তার আয়না চিরুনি স্নো-পাউডারের সমারোহ আর বিছানার লেপ-তোষক বেড-কভারের বৈভবই বোধহয় ওর সঙ্গে আমাদের ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। মাঝে মাঝে জমিদারের নায়েব যখন দাশরথির খোঁজখবর নিতে আসতেন তখন আমাদের মধ্যে সাড়া পড়ে যেত।

নায়েব কোনোদিনই খালি হাতে আসতেন না। শীতকাল হলে এক ঝুড়ি দার্জিলিঙের কমলালেবু অথবা নলেনগুড়ের সন্দেশ নিয়ে আসতেন, গরমের সময় টুকরি ভর্তি ল্যাংড়া আম, কখনো বা টিন ভর্তি বিলিতি বিস্কুট। জমিদারবাবুর নির্দেশ ছিল যে এইসব খাদ্যবস্তু যেন দাশরথির ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে সমান ভাগে বিতরণ হয়। সুতরাং এড়িয়ে চললেও দাশরথি এইখানেই আমাদের মন জয় করে নিয়েছিল।

শৈশবকাল থেকেই আমার একটা বদঅভ্যাস ছিল সাহিত্যে পাণ্ডাগিরি করা। সাহিত্য বিষয়ে নিজে কিছু বুঝি আর না বুঝি, এক লাইন লিখতে পারি আর না পারি, হাতের লেখা পত্রিকা সম্পাদনা করা বা সাহিত্যসভার উদ্যোগ আয়োজন করা ছিল আমার নেশা এবং এ-কাজে আমার উৎসাহে কোনো-দিন ভাটা পড়েনি। আমার এই নেশার সবচেয়ে বড় যোগানদার ছিল আমার সতীর্থ ও অভিন্নহৃদয় বন্ধু হরপ্রসন্ন। শ্রীহট্টের ছেলে, অসাধারণ তার বুদ্ধি। প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল। ব্যক্তিত্বের ছাপ ছিল তার কথাবার্তায়, চোখে মুখে চেহারায়। দুষ্টুমি বুদ্ধি যোগাতে হরপ্রসন্ন ছিল অদ্বিতীয়।

হরপ্রসন্নই আবিষ্কার করল, দাশরথি প্রতিদিন বিকেলে খেলার মাঠ ফাঁকি দিয়ে উত্তরায়ণের উত্তর দিকের খোয়াইয়ের তালগাছতলায় বসে রোজ কবিতা লেখে।

এ সংবাদে আমি খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। আগামী পূর্ণিমার দিনে আদ্যবিভাগের ছাত্রদের যে সাহিত্যসভা হবে তাতে

একজন নতুন কবিকে আবিষ্কার করার কল্পনায় আমি মশগুল। কিন্তু প্রস্তাবটি দেবার আগে দাশরথির কবিত্বশক্তির পরিচয় পাই কী প্রকারে।

হরপ্রসন্নই একদিন এই সমস্যার সমাধান করে দিল। সেলাই করা এক দিস্তা রুলটানা কাগজ এনে হরপ্রসন্ন বললে— 'যাকে তুমি আবিষ্কার করার উৎসাহে মশগুল ছিলে তার কবিতা পড়ে দেখ।'

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম—'তুমি এ খাতা কি করে পেলে ?'

পাতলা ঠোঁটে মুচকি হাসি এনে হরপ্রসন্ন বললে—'আজ বিকেলে দাশরথি কবিতা লিখতে না গিয়ে বোলপুর গেছে মাথার সুগন্ধী তেল কিনতে। এই সুযোগে ওর বিছানার বালিশের তলা থেকে এই খাতা আবিষ্কার।'

কবিতার খাতায় চোখ বুলিয়েই চক্ষুস্থির। একেকটি কবিতা যেন একেকটি পাঁচালী। পাতার পর পাতা অন্ত্যে মিল দেওয়া কবিতা। কোনোটার নাম 'শান্তিনিকেতনে সূর্যাস্ত', কোনোটার নাম 'আম্রকুঞ্জের কোকিল'। আমার উৎসাহের মাথায় হরপ্রসন্ন ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিল। এ-কবিতা সাহিত্যসভায় পড়তে দিলে শিশুবিভাগের ছেলেদের টিটকারী আর হাসাহাসিতে মুখ দেখানো দায় হয়ে উঠবে।

হরপ্রসন্নকে বললাম—'যাক, খাতাটা দেখিয়ে আমাকে তুমি বাঁচিয়ে দিয়েছ। এ প্রসঙ্গে দাশরথিকে আর কোনো কথা বলা নয়। তুমি যথাস্থানে লেখাটি রেখে এসো।'

হরপ্রসন্ন বললে—'খাতা আমি রেখে আসছি। কিন্তু দাশরথি কিন্তু সহজে তোমাকে রেহাই দেবে না।'

হরপ্রসন্নর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। সাহিত্যসভার সম্পাদক আমি, লেখা সংগ্রহের কাজ পুরোদমে চলছে। গল্প,

কবিতা, ভ্রমণকাহিনী, গুটিপোকা সম্বন্ধে প্রবন্ধ ইত্যাদি সংগ্রহ হয়েছে। বাকি আছে শুধু আবৃত্তি কে কে করবে আর গান। সভাপতি হবেন আমাদের বাংলাক্লাসের মাস্টারমশাই বিশীদা, প্রমথনাথ বিশী।

সেদিন রবিবার। সকালবেলায় থার্ড পিরিয়ডে আমাদের কোনো ক্লাস ছিল না। হরপ্রসন্ন আর আমি আশ্রমসীমানার বাইরে জামগাছতলায় অতুলের চায়ের দোকানে বসে গুলতানি করছি, এমন সময় দাশরথি সেখানে এসে উপস্থিত। দাশরথির এটা জানা ছিল যে সকালে দু-এক পিরিয়ডের ক্লাসের পর ফাঁক পেলেই আমরা অতুলের চায়ের দোকানে এসে আড্ডা দিই। গরম সিঙাড়া আর চা সংযোগে মাস্টার, কলেজের অধ্যাপক এবং ছাত্ররা একাত্ম হয়ে যে-কোনো বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্কে মেতে উঠি। সত্যি কথা বলতে কি, চায়ের দোকানের আড্ডাই ছিল আমাদের জ্ঞানার্জনের প্রকৃত পাঠশালা।

প্যারিসে বুলেভার-এর রেস্তোরাঁ যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন যে ফুটপাথের উপর চেয়ার টেবিল সাজানো এইসব রেস্তোরাঁয় ফরাসী বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক প্রভৃতি কফির কাপ বা বিয়ারের বোতল নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আসর জমিয়ে তোলেন। দোকানের মালিক পয়সা পেলেন কি পেলেন না তা নিয়ে মাথা ঘামান না। তাঁর রেস্তোরাঁয় শিল্পী সাহিত্যিকের সমাবেশের উপরই দোকানের কৌলিন্য নির্ভর করছে। এমনও হয়েছে, কোনো উঠতি কবি, রোজগারপাতি কিছুই নেই, তাকে দিনের পর দিন দোকানের মালিক খাইয়ে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতে তার দেনা শোধ হোক আর না হোক, শিল্পী বা সাহিত্যিক পয়সার অভাবে তার দোকানে আসর জমাবে না এ কখনো হতেই পারে না।

শান্তিনিকেতনের গাছতলার চায়ের দোকানের সঙ্গে প্যারিস

শহরের ফুটপাথের রেস্তোরাঁর এই দিক দিয়ে আশ্চর্য মিল আছে। অতুল কাপের পর কাপ চা সিঙাড়া ডিমের অমলেট অথবা কোনোদিন পান্তুয়া দিয়ে যায়, খাতায় লিখে হিসেব রাখে। মাসের শেষে কেউ দাম চুকিয়ে দিল ত ভালই, না দিলেও ভ্রূক্ষেপ নেই। চা সে দিয়েই যাবে। অতুলের এই বদান্যতার জন্যই একদিন চায়ের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে বাঁকুড়ার লোক সেই যে বাঁকুড়ায় চলে গেল আর ফিরে এল না।

যে কথা বলছিলাম। আমাকে আর হরপ্রসন্নকে দেখে দাশরথি চায়ের দোকানে এসে হাজির। আমরা দুজন তখন আমগাছের তলায় মোড়া পেতে চায়ের অপেক্ষা করছি, দাশরথি আরেকটা মোড়া টেনে এনে আমাদের পাশে বসেই বললে—'তোমরা কি চা বলে দিয়েছ?'

আমি বললাম—'হ্যাঁ, তোমার জন্যেও বলব?'

দাশরথি কোনো কথা না বলে অতুলের খড়ের চালাঘরের ভিতরে চলে গেল। খানিক পরে ও বেরিয়ে এল, পিছনে একটা ট্রে-হাতে অতুল। তাতে তিনটি পিরিচে দুটি করে পান্তুয়া, দুটি করে সিঙাড়া সাজানো। ট্রে থেকে খাবারটা বেঞ্চির উপর রাখতে রাখতে অতুল বললে—'অমলেট এখুনি ভেজে দিচ্ছি, দেরি হবেক্ নাই।'

আমি হতবাক বিস্ময়ে হরপ্রসন্নর দিকে চাইতেই ও চোখ টিপে ইশারা করল। অর্থাৎ উপস্থিত চালিয়ে যাও, পরে কথা হবে।

এটুকু অনুমান করতে দেরি হল না যে, জমিদারনন্দন দাশরথি আজ তার দুই সতীর্থকে আপ্যায়ন করছে। সুতরাং আমরাই বা তার এই সদিচ্ছায় বাদ সাধি কেন।

পান্তুয়া খাবার পর সিঙাড়ায় কামড় দিয়ে হরপ্রসন্ন বলল—'তারপর দাশরথি, কী মনে করে আজ হঠাৎ চায়ের দোকানে?'

মুখে সলজ্জ হাসি এনে দাশরথি বললে—'অফ্ পিরিয়ডে তোমরা রোজই এখানে চা খেতে আসো আমি দেখেছি। আজ ইচ্ছে হল আমিও সঙ্গে যোগ দিই।'

আমি উৎফুল্ল হয়ে বললাম—'তা ইচ্ছে করলে তুমি তো রোজই আমাদের সঙ্গে আসতে পারো।'

খুশি হয়ে দাশরথি বললে—'আমিও তো তাই-ই চাই। তোমরা আমাকে ডাকো না বলেই আমি একা আসতে সঙ্কোচ বোধ করি।'

হরপ্রসন্নর দিকে তাকিয়ে দেখি চোখের ভ্রূ কোঁচকানো, মুখে বিরক্তির ভাব।

কথাটা বেফাঁস হয়ে গেছে অনুমান করে আমি চুপ করে আছি, এমন সময় অতুল অমলেট আর চা নিয়ে এল।

অমলেট শেষ করে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছি এমন সময় দাশরথি হুম করে এমন একটা কথা বলে ফেলল যে মুখের চা যেন আর গলা দিয়ে নামতে চাইল না।

দাশরথি বললে—'আসছে পূর্ণিমার দিন সাহিত্যসভা হচ্ছে, সেদিন আমি একটা কবিতা পড়তে চাই।'

দুষ্টুমিভরা হাসি নিয়ে হরপ্রসন্ন আমার দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাতে লাগল। ভাবখানা, নাও এবার ঠ্যালা সামলাও।

এ রকম একটা আচমকা প্রস্তাবের জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমি বিমূঢ় অবস্থায় চুপ করে আছি। কী উত্তর দেব। মুখে এখনো পান্তুয়া-সিঙাড়া-অমলেটের স্বাদ লেগে আছে। কী করে বলি যে ওসব হবে না।

উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা বিপদ থেকে উদ্ধার করল হরপ্রসন্ন। সে তৎক্ষণাৎ বললে—'এ অতি উত্তম প্রস্তাব। তবে কি জানো, সাহিত্যসভায় আশ্রমবাসী সবাই আসেন, আমাদের মাস্টার-

মশাইরা ত থাকেনই, এমন কি গুরুদেবও মাঝে মাঝে উপস্থিত হন। এ ক্ষেত্রে তোমার কবিতা না পড়ে আমরা সাহিত্যসভার জন্য নির্বাচন করতে পারি না।'

উৎসাহিত হয়ে দাশরথি বললে—'আমিও তাই চাই। অনেকগুলি কবিতা আমার লেখা আছে। সবগুলি তোমাদের পড়ে শোনাবো তার মধ্যে যে কোনো একটি তোমরা বেছে নিতে পারো।'

এ কথা বলেই দাশরথি পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক তাড়া ভাঁজ করা কাগজ বার করল। এখনই কবিতা পড়ে শোনাতে চায়। আমি মরিয়া হয়ে বাধা দিয়ে বললাম—'থাক থাক, এখন আর পড়তে হবে না। আর তো মাত্র মিনিট দশ সময় আছে, এখনই পিরিয়ড ওভার হবে, তারপরেই জগদানন্দবাবুর কাছে অঙ্কের ক্লাস। আজ আর শোনার সময় হবে না।'

এ কথায় দাশরথি যেন একটু দমে গেল। কাগজগুলি আবার পকেটে ভরতে ভরতে বলল—'তাহলে কবে তোমাদের সময় হবে?'

হরপ্রসন্ন বললে—'বুধবার ত আমাদের ছুটির দিন, সেদিন সকালে এখানে এসেই কবিতা শোনা যাবে। কী বলো?' আমার সম্মতির জন্য হরপ্রসন্ন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলল।

আমি সায় দিয়ে বললাম—'সেই ভালো। এমন নিরিবিলি জায়গাই কবিতা শোনার পক্ষে উপযুক্ত।'

বুধবার সকালে মন্দিরের উপাসনার পরই দাশরথি এসে আমাদের দুজনকে পাকড়াও করলে। বললে—'রান্নাঘরে গিয়ে বোঁদে আর মুড়ি জলখাবার না খেয়ে চলো আমরা অতুলের চায়ের দোকানে যাই। জলখাবারটা ওখানেই সারা যাবে।'

এতো সকালে চায়ের দোকানে যাওয়াটা আমার মনঃপূত ছিল না, কিন্তু হরপ্রসন্ন উৎসাহ দেখিয়ে বললে—'দাশরথি ঠিকই বলেছে। এখন গেলে চায়ের দোকানে ভিড় হবে না। ঘণ্টাখানেক বাদে একে একে সবাই ওখানে আড্ডা জমাবে। তার আগেই কবিতা পাঠের পালা চুকিয়ে ফেলাই ভালো।'

অগত্যা রাজি হতে হল। দাশরথি খুশি হয়ে বললে—'তাহলে তোমরা অতুলের দোকানে সোজা চলে যাও, যা যা খেতে চাও অর্ডার দিয়ে রাখো। আমি ঘর থেকে খাতা নিয়েই চলে আসছি।'

রাস্তায় যেতে যেতে হরপ্রসন্নকে বললাম—'কাজটা কি ভালো হচ্ছে? বুঝতেই তো পারছো ওর কবিতা কোনক্রমেই পত্রিকা বা সাহিত্যসভায় নেওয়া যেতে পারে না। ওর সঙ্গে ছলনা করাটা কি ঠিক হচ্ছে?'

হরপ্রসন্ন অকাট্য যুক্তি তুলে ধরল। বললে—'বুঝতেই তো পারছো যে জমিদার মহাশয় পুত্রকে লেখাপড়া শেখবার জন্য এখানে পাঠান নি, কবিযশঃপ্রার্থী ছেলেকে এখানে পাঠিয়েছেন কবিখ্যাতি অর্জনের জন্যে. আমরা হয়তো তার কিছু সুযোগ করে দিতে পারি, অন্তত তার চেষ্টাও তো আমাদের করা উচিত।'

আমি প্রতিবাদ করে বললাম—'কিন্তু যার হবার নয় তার কী করে হবে। ওকে ভাঁওতা না দিয়ে সোজাসুজি সে কথা বলে দেওয়াই তো ভালো।'

হরপ্রসন্ন তার দুই চোখে দয়া আর করুণা এনে বললে—'গোড়াতেই ওকে নিরাশ করে দেওয়াটা ঠিক নয়। তাছাড়া ওকে হাতছাড়া করতে চাইনে। অতুলের দোকানে চা সিঙাড়া যতদিন ওর উপর দিয়ে চালানো যায় মন্দ কি।'

হরপ্রসন্নর ফিচলেমি বুদ্ধি এতক্ষণে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি বললাম—'ওকে আশা দিয়ে ঝুলিয়ে রেখে পরে নিরাশ করার নির্মম কাজটা আমার দ্বারা কিন্তু হবে না।'

'—ওর জন্যে তুমি ভেবো না। ও কাজের ভারটা আমার উপর ছেড়ে দাও, যা করার আমিই করব।' হরপ্রসন্ন সম্পূর্ণ দায়িত্বটা নিজের ঘাড়ে নিয়ে আমাকে চুপ করিয়ে দিল।

অতুলের চায়ের দোকানে এসে দেখি গাছতলায় মোড়া আর বেঞ্চি সাজিয়ে রেখে অতুল সিঙাড়া ভাজতে ব্যস্ত। আজ বুধবার, ছুটির দিন। কিছুক্ষণ পরেই খদ্দেররা একে একে এসে আড্ডা জমাবে। কবিতা পাঠ শুনতে হবে, তাই আমাদের চাই একটু নিরিবিলি জায়গা। জামগাছতলা এড়িয়ে অদূরে ডালপালা বিস্তৃত করে যে শিরীষ গাছটা একা দাঁড়িয়ে আছে তার তলায় তিনটি মোড়া নিয়ে আমরা বসে পড়লাম। দাশরথির হয়ে হরপ্রসন্ন অতুলকে খাবারের অর্ডার দিয়ে এল।

ইতিমধ্যে দাশরথি এসে উপস্থিত, হাতে খবরের কাগজে মোড়া বিরাট বাণ্ডিল। চোখেমুখে উৎসাহ আর উত্তেজনা যেন ধরে না। মোড়াটা টেনে নিয়ে বসে পড়েই বললে—'চায়ের জন্য বলে দিয়েছ ত ?'

হরপ্রসন্ন কোনো কথা না বলে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিল যে বলা হয়েছে।

আমি বললাম—'আগে চা-টা খেয়ে নিই, তারপর কবিতা শোনা যাবে। কি বল ?'

সঙ্গে সঙ্গে হরপ্রসন্ন বললে—'সেইজন্যেই তো এসেই চায়ের অর্ডার দিয়েছি। প্রথমত কবিতা পড়বার সময় চা এলে সুর কেটে যাবে, দ্বিতীয়ত অন্যান্যদের ভিড় বেড়ে গেলে কনসেন্ট্রেশনে বাধা ঘটতে পারে।'

এমন সময় অতুল এক থালা গরম সিঙাড়া আর এক প্লেট

পাত্তয়া দিয়ে বললে—'সব একসাথে হবেক নাই। আগে এই দিয়ে চালাতে থাকুন, পরে অমলেট আর চা আসবেক।'

অর্ডারের বহর দেখে আর শুনে বিস্মিত হয়ে আমি হরপ্রসন্নর দিকে তাকালাম। ও নির্বিকার চিত্তে গরম সিঙাড়া তুলে কামড় দিয়েই বললে—'গরম-গরম থাকতে খাওয়া শুরু করো।'

খাওয়া-দাওয়ার পাট যখন চুকল তখন দাশরথি খবরের কাগজে মোড়া বাণ্ডিল খুলে বার করল সেই খাতা, যা হরপ্রসন্ন চুরি করে এনে দেখিয়েছিল। আমি নিরুপায়। সেই কবিতাই শুনতে হবে, 'খোয়াই ডাঙায় সূর্যাস্ত', 'আম্রকুঞ্জের কোকিল।' তা-ই শুনতে হল। একঘেয়ে একটানা সুরে কবিতা পাঠ আর থামতে চায় না। যেন একটা চরকার ঘড়ঘড় একটানা আওয়াজ চলছে ত চলেইছে। ছুটি কবিতাতেই ছু'দিস্তে ফুলস্ক্যাপ রুলটানা কাগজ নিঃশেষ এবং তা পড়ে শেষ করতে প্রায় আধ ঘণ্টার উপর সময় পার হয়ে গেল।

কবিতা-পাঠ শেষ করে দাশরথি আমার মুখের দিকে তাকাল কিছু একটা মন্তব্যের আশায়। আমি উল্টো দিকের আকাশে তখন মেঘের খেলা নিরীক্ষণে ব্যস্ত। অপ্রিয় কথাটা বলার ভার যখন হরপ্রসন্নই নিয়েছে তখন যা বলবার ও-ই বলুক।

আমার নীরবতা লক্ষ্য করেই হরপ্রসন্ন দাশরথিকে বললে—'অসুবিধেটা কোথায় হচ্ছে জানো? আর ছ'দিন বাদে আমাদের সাহিত্যসভা। তার সব লেখা ঠিক হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া তোমার কবিতা আকারে এত দীর্ঘ যে শেষ মুহূর্তে এতটা সময় দেবার মতো জায়গা করা সম্ভব নয়। তার চেয়ে বরঞ্চ এ সাহিত্যসভাটা ছেড়ে দাও, পরের মাসে নিশ্চয় তোমার জন্যে সময়ের ব্যবস্থা করা যাবে।'

হরপ্রসন্নর মতলব পরিষ্কার বোঝা গেল। অর্থাৎ আরো একমাস দাশরথিকে হাতে রাখতে চায়।

দাশরথি দমবার পাত্র নয়। বললে—'বুঝতে পারছি এ কবিতা তোমাদের পছন্দ হয়নি। এখনো তো ছদিন সময় আছে, ইতিমধ্যে আমি আরেকটা নতুন কবিতা লিখে ফেলব।'

আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। আমার মুখের অবস্থা অনুধাবন করে হরপ্রসন্নই বললে—'সেই ভালো। তুমি তো লিখে যাও, আবার আমরা এখানেই এসে কবিতা শুনব। তারপর যা হয় কিছু একটা স্থির করা যাবে।'

ইতিমধ্যে জামগাছতলায় চায়ের আড্ডায় বসে গিয়েছেন শিল্পী বিনোদদা আর রামকিঙ্করদা, সেই সঙ্গে আছেন মৌলানা জীয়াউদ্দীন ও সৈয়দ মুজতবা আলী। নন্দনতত্ত্ব নিয়ে চায়ের পেয়ালায় তুফান শুরু হয়ে গিয়েছে। আমি আর হরপ্রসন্ন আমাদের মোড়া দুটি নিয়ে ওঁদের দলে ভিড়ে পড়লাম, দাশরথি দুদিস্তে কবিতা আবার খবরের কাগজে মুড়ে ডরমেটারির দিকে চলে গেল।

ইতিমধ্যে আমরা সাহিত্যসভার ব্যবস্থাদির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, দাশরথির খোঁজখবর বিশেষ রাখিনি। তবে হরপ্রসন্ন খোঁজ নিয়ে জানতে পারল যে দাশরথি খেলার সময় রোজই খাতা পেন্সিল নিয়ে উত্তরায়ণের উত্তর দিকের খোয়াইয়ের তালগাছতলায় বসে দিস্তার পর দিস্তা কবিতা লিখে চলেছে।

সাহিত্যসভা যেদিন হবে তার আগের দিন সকালে দাশরথি কাতরভাবে অনুরোধ জানালো, একটা নতুন কবিতা লিখেছে এবং তা শুনতেই হবে।

যথারীতি বিকেলে অতুলের চায়ের দোকানে গিয়ে বসা হল, চা-সিঙাড়া অমলেটের অর্ডার দাশরথিই দিল। Q-র

পিঠে U-র মতো হরপ্রসন্ন আমার সঙ্গে আছে। চায়ের পাট চুকে যাবার পর দাশরথি কাগজের বাণ্ডিল খুলে পড়তে শুরু করল।

কবিতার নাম—'নাট্যঘরে বায়োস্কোপ।' কবিতার এমন উদ্ভট নাম আর বিষয়বস্তু শুনে আমাদের চক্ষুস্থির। এই কবিতার নামকরণের একটু ইতিহাস আছে, সেটা এখানে বলে নেওয়া দরকার। শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারিক ও রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোট ভাই সু মুখোপাধ্যায়কে আমরা সবাই 'সুদা' বলে ডাকতাম, ছাত্রমহলে তিনি ছিলেন সবার আপনজন। বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর দখল ছিল অসাধারণ, নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উদ্ভট কিছু দেখিয়ে আমাদের তাক লাগিয়ে দিতেন। এই সুদা একবার কোথা থেকে কিছু ফিল্‌ম্ আর একটা প্রোজেক্টার সংগ্রহ করে শান্তিনিকেতনে নিয়ে এলেন। উদ্দেশ্য, শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের বায়োস্কোপ দেখাবেন। দিকে দিকে এই বার্তা রটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট দিনে আর নির্ধারিত সময়ে আশ্রমবাসীরা নাট্যঘরে ভেঙে পড়ল। এত ভিড় যে বসার জায়গা পাওয়া দুষ্কর। কারণ শান্তিনিকেতনে বায়োস্কোপ দেখানোর ঘটনা সেইবারই প্রথম। অত্যধিক ভিড়ের জন্য শুধু একদিন নয়, বেশ কয়েকদিন ধরেই সুদাকে নাট্যঘরে বায়োস্কোপ দেখাতে হয়েছিল। এই ঘটনা নিয়েই দাশরথির এই কবিতা। সেই একটানা ঘড়ঘড় সুরে দীর্ঘ কবিতা দাশরথি পড়ে গেল। সে কবিতার কথা কিছুই আজ আর মনে নেই শুধু আরম্ভের দুটি লাইন ও শেষের দুটি লাইন ছাড়া।

কবিতা শুরু হয়েছে এইভাবে—

'সুদা দেখাইতেছেন বায়োস্কোপ নিশিনিশি
নাট্যঘরে লোক করিতেছে গিশিগিশি।'

এর পরেই পাতার পর পাতা বর্ণনা চলল বায়োস্কোপের কাহিনীর। সেইসঙ্গে আছে নাট্যঘরে ছেলেমেয়েদের জটলার কথা, কার কোলের ছেলেটা ভিড়ের চাপে ককিয়ে কেঁদে উঠল, কোন মাস্টারমশাই শিশুবিভাগের দুরন্ত ছেলেদের চেঁচামেচি থামাবার জন্যে শাসন করছিলেন ইত্যাদি পাতার পর পাতা নানা ফিরিস্তির পর কবিতাটি শেষ হয়েছে এইভাবে :

'স্থানাভাবে হতাশ হয়ে ফিরে গেছে কেউ কেউ
শালবীথিতে কুকুরগুলি করতেছিল ঘেউ ঘেউ।'

রুলটানা ফুলস্ক্যাপ কাগজে কুড়ি পৃষ্ঠাব্যাপী কবিতা। একে পাঁচালী ছাড়া আর কী বলা যায়!

কবিতা পড়ে শেষ করে কিছু একটা মন্তব্যের আশায় উৎসুক নয়নে দাশরথি আমার দিকে তাকিয়ে। এ-কবিতা চলবে না, মুখের উপর সে-কথা আর বলি কি করে। আমি মাটির দিকে চেয়ে একটা কাঁকর তুলে আরেকটাকে তাক করে ছুঁড়ে চলেছি, মুখে কোনো কথা নেই। হরপ্রসন্ন বুঝে নিল এ-কবিতা আমার পছন্দ হয়নি এবং সাহিত্যসভায় পড়তে আমি কিছুতেই দেব না। অগত্যা হরপ্রসন্নই আমার হয়ে দুর্মুখের কাজটা করে দিল। লেখা নির্বাচনের ব্যাপারে একটা নির্মমতার দিক আছে, যা পরবর্তী কালে পত্রিকা সম্পদনার কাজে আমাকে বহুজনের কাছ থেকে বহুবার অভিসম্পাত কুড়োতে হয়েছে এবং যার শুরু হয়েছিল সেই কৈশোর জীবন থেকেই।

দাশরথির এত আশা আকাঙ্ক্ষা আর উৎসাহ হরপ্রসন্নর এক ফুৎকারে নির্বাপিত। হরপ্রসন্ন বললে—'আগামীকাল আমাদের সাহিত্যসভা। তোমাকে যে নতুন করে আরেকটা ছোটখাটো কবিতা লিখতে বলব সে সময়ও আর নেই। তুমি বরঞ্চ এবারের জন্য আর চেষ্টা না করে পরের মাসের সাহিত্যসভার জন্য এখন থেকে উঠে পড়ে লাগো।'

হরপ্রসন্নর বুদ্ধির বলিহারি! দাশরথিকে আরো একমাস ঝুলিয়ে রাখার পিছনে আসল উদ্দেশ্যটা অন্তত আমার বুঝতে দেরি হয়নি। কিন্তু দাশরথি একেবারে মুষড়ে পড়ল। কোনো কথা না বলে অতুলকে ডেকে চায়ের দাম চুকিয়ে দিয়ে খাতার বাণ্ডিল হাতে নিঃশব্দে চলে গেল।

এর পর থেকে দাশরথি পারতপক্ষে আমাদের এড়িয়ে চলত। অতুলের চায়ের দোকানে কতোদিন ঘন্টার পর ঘণ্টা আড্ডা জমিয়েছি, দূর থেকে দেখেও দাশরথি ধার মাড়ায় নি। তবে বিকেলবেলা খেলার মাঠে না হাজির হয়ে খোয়াইয়ে বসে কবিতা লেখা এখনো চলছে—এ খবর হরপ্রসন্নর কাছ থেকেই জানতে পারলাম।

আদ্যবিভাগের সাহিত্যসভায় অথবা হাতে লেখা 'প্রভাত' পত্রিকায় দাশরথির কোনো কবিতা স্থান না পেলেও ছাত্রমহলে ওর কবিতা লেখা নিয়ে হাসাহাসি শুরু হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে শিশুবিভাগের বিচ্ছু ছেলেদের দল দাশরথিকে দেখলেই দূর থেকে চিৎকার করে আবৃত্তি করত—'সুদা দেখাইতেছেন 'বায়োস্কোপে নিশিনিশি, নাট্যঘরে লোক করিতেছে গিশিগিশি'। দোষটা ছিল দাশরথিরই। আমাদের উপর অভিমান করে তার সেই কবিতা অন্যান্য ছাত্রদের ডেকে ডেকে পড়ে শুনিয়েছে সহানুভূতি আদায়ের উদ্দেশে। ফলে হিতে বিপরীত হল।

শুধু তাই নয়। ছোট ছেলেরা ওর কবিতা নিয়ে হাসাহাসি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে, এ নিয়ে ছাত্র পরিচালকের দরবারে সে নালিশ জানালে, অধ্যাপকদের কাছেও অভিযোগ জানাতে কসুর করে নি। এত করেও যখন ছেলের দলকে নিবৃত্ত করা গেল না তখন সে একদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কাছে ওর আর্জি নিয়ে উপস্থিত হল।

রবীন্দ্রনাথ সারাদিন নানাবিধ কাজের ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে কাটালেও কয়েকটি বিষয়ে তাঁর নিয়মনিষ্ঠা ছিল অপরিবর্তনীয়। শেষ রাত্রে তিনি শয্যাত্যাগ করতেন সাড়ে তিনটার সময়। তারপর ভোর চারটায় উত্তরায়ণের পুবদিকের খোলা বারান্দায় দেখা যেত আবছা অন্ধকারে তাঁর ছায়ামূর্তি, একটি চৌকিতে পুবদিকে মুখ রেখে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। ধীর স্থির ঋজু দেহ, যেন পাথরের কোনো মূর্তি আত্মস্থ অচঞ্চল। ভোর ছ'টায় ঊষাকালের প্রথম কিরণসম্পাত তাঁর ললাট স্পর্শ করা মাত্র সেই ধ্যানগম্ভীর মূর্তি আস্তে আস্তে আসন ছেড়ে ঘরে প্রবেশ করল। সকাল সাতটার মধ্যে চা বা কফির পাট চুকিয়ে কাগজ কলম নিয়ে সেই যে লেখার টেবিলে বসলেন বেলা এগারোটার আগে তিনি সেই টেবিল ছেড়ে উঠতেন না। নিতান্ত কোনো জরুরী প্রয়োজন না পড়লে তাঁর এই নিয়মের ব্যতিক্রম পারতপক্ষে ঘটত না।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা হচ্ছে এই যে, নিশাবসানে ভোর চারটা থেকে ছয়টা, এই দু' ঘণ্টা ধ্যানসমাহিতচিত্তে তিনি যা চিন্তা করতেন বা উপলব্ধি করতেন, তা তিনি প্রকাশ করতেন পরবর্তী চার ঘণ্টার রচনায়। কখনো কবিতায়, কখনো প্রবন্ধে, কখনো বা গানে। বোধহয় এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রমের ছাত্রদের প্রাতে ও সন্ধ্যায় পনেরো মিনিট গাছতলায় বা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে উপাসনায় বসার রীতি প্রবর্তন করেছিলেন। এটাও একটা ডিসিপ্লিন। সারাদিনের মধ্যে কিছু সময় ধ্যানস্থ হয়ে বসা। কিন্তু আমার মতো ছাত্র ঐ সময়টা প্রতিদিনই অদূরে উপবিষ্ট ছাত্রের গায়ে তাক করে কাঁকর ছোঁড়ার কাজে লাগিয়েছি। বোধহয় সেই অভ্যেসটাই পরবর্তী জীবনে অপরের গায়ে কাদা ছোঁড়ার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

এবার রবীন্দ্রনাথ ও দাশরথি প্রসঙ্গে ফিরে আসি। একদিন

সকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঘরের টেবিলে বসে একান্ত মনে একটা লেখায় মগ্ন, এমন সময় দাশরথি তার সেই দিস্তা দিস্তা কবিতার বাণ্ডিল নিয়ে সেখানে উপস্থিত। আমি ইতিপূর্বে এ-প্রসঙ্গে লিখেছিলাম যে নানা কাজের ব্যস্ততার মধ্যে থাকলেও ছাত্রদের জন্য, সে ছোট বা বড় হোক, তাঁর দ্বার ছিল সর্বদা উন্মুক্ত। সুতরাং দাশরথিও সটান রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হওযায় কোনো বাধা ঘটেনি।

রবীন্দ্রনাথ যত কাজেই ব্যস্ত থাকুন না কেন তাঁর কাছে কোনো ছাত্র এলে নিজের কাজ সরিয়ে তার কথা শুনতেন। দাশরথির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না।

দাশরথি বললে—'আমার কিছু কবিতা আপনাকে পড়ে শোনাতে চাই।'

অসহায়ভাবে রবীন্দ্রনাথ দাশরথির দিকে তাকিয়ে বললেন—'কিছু কবিতা হলে শুনতে আপত্তি ছিল না কিন্তু তোমার হাতের খাতাগুলি দেখে মনে হচ্ছে গন্ধমাদন পর্বত এনে হাজির করেছো। খাতাগুলি আজ তুমি আমার কাছে রেখে যাও, কাল সকালে আবার এসো। অবসর সময়ে দেখে রাখব।'

দাশরথি ছাড়বার পাত্র নয়। কবিতা সে নিজে পড়ে না শোনালে ওর তৃপ্তি নেই। সে মরিয়া হয়ে এসেছে, আজ একটা হেস্তনেস্ত না করে ও যাবে না। কবিতা সে পড়ে শোনাবেই।

অগত্যা রবীন্দ্রনাথ হাতের কলমটা খাপে ভরে চেয়ারে দেহ এলিয়ে দিয়ে বললেন—'তাহলে পড়, আমি শুনি।'

ব্যস আর যায় কোথা। দাশরথি উৎসাহের সঙ্গে গলা কাঁপিয়ে একটার পর একটা খাতা পড়ে যেতে লাগলো। পাশের ঘরে রবীন্দ্রনাথের একান্ত সাচব অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের অসহায় অবস্থা দেখে একটা জরুরী চিঠি নিয়ে দরজার চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছেন, অনুমতি পেলেই ঘরে ঢুকবেন। যদি তাতে

দাশরথির চৈতন্যোদয় হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হাত তুলে ইশারায় অমিয়বাবুকে ঘরে আসতে নিষেধ করলেন। দাশরথি ততক্ষণে দ্বিতীয় খাতা শেষ করে তৃতীয় খাতা খুলে শুরু করে দিয়েছে।

প্রায় দু ঘণ্টা ধরে কবিতা পড়ার পর দাশরথি থামল, অসীম ধৈর্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সবগুলি কবিতাই শুনলেন।

এবার দাশরথি আমাদের বিরুদ্ধে জমিয়ে রাখা অভিযোগগুলি একে একে রবীন্দ্রনাথের কাছে সবিস্তারে শুনিয়ে গেল। তারপর অভিমানের সঙ্গে বলল—'দেখুন, আপনিও কবি, আমিও কবি। আমার এই কবিতা কি সাহিত্যসভায় বা 'প্রভাত' পত্রিকায় নেওয়া যায় না? আপনিই বলুন—'

রবীন্দ্রনাথ বিস্ফারিত চোখে বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন—'তাই নাকি, সম্পাদকরা তোমার কবিতা কি নিল না? ভারি অন্যায়, ভারি অন্যায়। এই জন্যেই সম্পাদকদের আমি ভয় করে চলি। ওরা বড় কড়া লোক, কিছুতেই ওদের সন্তুষ্ট করা যায় না।'

এ কথা শুনে দাশরথি উৎসাহিত হয়ে বলল—'যা বলেছেন। আমি ওদের সন্তুষ্ট করবার জন্যে অতুলের চায়ের দোকানে দিনের পর দিন চা মিষ্টি খাইয়ে কবিতা পড়ে শুনিয়েছি আর প্রতিবারই ওরা বলেছে—এটা হয়নি, আরেকটা লেখো।'

রবীন্দ্রনাথ এ কথা শুনে চোখেমুখে আরো বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—'তাই নাকি, ওইটাই তো ভুল করেছো। তোমার কবিতা যদি একবার সাহিত্যসভায় পড়তে দেয় তারপরে কি তুমি ওদের আর পাত্তা দেবে? ওরা যে তোমাকে হাতছাড়া করতে চায় না। যাক, ওরা শুধু একা আমাকেই বোকা বানায় নি, তোমাকেও বোকা বানিয়ে ছেড়েছে।'

অবাক হয়ে দাশরথি বললে—'আপনাকে বোকা বানিয়েছে কিরকম?'

হতাশা মিশ্রিত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ বললেন—'আর বলো

কেন। ওরা প্রায়ই আমার কাছে আসে ওদের পত্রিকা কিরকম হয়েছে দেখাবার জন্যে, সাহিত্যসভায় কোন কবিতা কী ভাবে আবৃত্তি করতে হবে জেনে নিতে। আমি ওদের লজেঞ্জুস, বিস্কুট, সন্দেশ খাওয়াই কিন্তু একবারও ওদের সাহিত্যসভায় আমাকে কবিতা পড়তে বলে না। মাঝে মাঝে সভাপতির অভাব ঘটলে আমাকে সাহিত্যসভার সভাপতি করে, ফুলের মালা পরিয়ে বসিয়ে দেয় কিন্তু কখনো বলে না—'আপনি একটা কবিতা পড়ুন।'

সমবেদনায় দাশরথির মুখ করুণ হয়ে উঠল। সহানুভূতির সঙ্গে বললে—'আপনারই যখন এই দশা তখন আমাকে ওরা পাত্তা দেবে কেন। তবে আমিও ছাড়ছি না। আমার কবিতা সম্বন্ধে আপনার মতামত একটা কাগজে এখনই আপনি লিখে দিন। তারপর আমি ওদের একচোট দেখে নিচ্ছি।'

রবীন্দ্রনাথের মুখে কৌতুকের হাসি। তৎক্ষণাৎ একটা সাদা কাগজ টেনে নিয়ে খসখস করে লিখে দিলেন—

কবিতা দুই শ্রেণীর, ভালো অথবা মন্দ। এর মাঝামাঝি নেই। তোমার কবিতা ভালো শ্রেণীর। অভিজ্ঞতার সঙ্গে তোমার কবিতা লেখার শক্তি বাড়বে বলেই আশা করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আর দাশরথিকে পায় কে। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া প্রশংসাপত্রটি হাতে পেয়ে আশ্রমময় তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিলে। রাস্তায়, ডরমেটরিতে, ক্লাসে যখন যেখানে যাকে পাচ্ছে তাকেই রবীন্দ্রনাথের চিঠি দেখাচ্ছে আর বলছে—'এবার কেমন জব্দ, আমার কবিতা সাহিত্যসভায় না নিয়ে বাছাধন সম্পাদক কী করে একবার দেখে নিতে চাই।'

হরপ্রসন্ন বললে—'দাশরথি মহা ফ্যাসাদ বাধিয়ে তুললে। তাছাড়া গুরুদেবই বা ওকে প্রশংসাপত্র লিখে দিলেন কেন বুঝতে পারছি না। এখন কি করবে?'

আমি বললাম—'চলো গুরুদেবের কাছে। ওঁকে জিজ্ঞাসা করা যাক এখন আমরা কি করব।'

দুজনে সোজা উত্তরায়ণে গুরুদেবের কাছে গিয়ে হাজির। আমাদের দেখেই হাসতে হাসতে বললেন—'জানতাম তোরা আমার কাছে ছুটে আসবি।'

আমি বললাম—'কিন্তু দাশরথিকে ওরকম একটা চিঠি লিখে দিয়ে আমাদের কি বিপদে ফেলেছেন বলুন তো?'

রবীন্দ্রনাথ বললেন—'না লিখে দিলে আমিই কি বিপদ থেকে রেহাই পেতাম। তোদের সাহিত্যসভায় বা পত্রিকায় ওর কবিতা নেওয়া না নেওয়ার বিচারের দায়িত্ব তোদের। সেই স্বাধীনতায় তো আমি হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছিনে। এত উৎসাহ নিয়ে ছেলেটা আমার কাছে এসেছিল সমধর্মী বলেই তো, আমিই বা ওকে নিরাশ করি কেন।'

নিজের আশ্রমের ছেলের প্রতি গুরুদেবের অসীম মমতার আরেকটি পরিচয় পেয়ে সেদিন আমরা চলে এসেছিলাম। আর এটাও বুঝেছিলাম, দাশরথির মধ্যে কবিতা সম্পর্কে ভালো মন্দর বোধ বিন্দু মাত্র না থাকা সত্ত্বেও ওর কবিতার প্রতি ভালবাসা, উৎসাহ আর নিষ্ঠাকে তিনি অবজ্ঞা করতে পারেন নি।

গুরুদেবের চিঠি নিয়ে দাশরথি অনেক দাপাদাপি করা সত্ত্বেও আমাদের মনকে ও বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনি।

দেখতে দেখতে পৌষ মাস এসে গেল, আমাদেরও সর্বনাশ সমুৎপন্ন। পৌষ মাসের গোড়াতেই ক্লাস প্রোমোশনের পরীক্ষা শুরু, তারপর সাতই পৌষের উৎসব। উৎসব শেষে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে, তার পরেই এক সপ্তাহের জন্য একস্‌কারশনে বেরিয়ে পড়া। সাহিত্যসভা ও পত্রিকা প্রকাশনার কাজ তখন শিকেয় উঠেছে। পরীক্ষার পড়া নিয়ে আমরা সবাই ব্যস্ত, দাশরথির কবিত্ব-শক্তির আর কোনো পরিচয় নেবার অবকাশও আমাদের ছিল না।

তিন দিন ব্যাপী পৌষ উৎসবের হৈচৈ আর হাঙ্গামা চুকে যাবার পর ১০ই পৌষ সকালে লাইব্রেরীর বারান্দায় যারা প্রমোশন পেয়েছে তাদের নামের তালিকা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি আর হরপ্রসন্ন দুরুদুরু বক্ষে তালিকার সামনে গিয়ে দেখি আমরা দুজনেই প্রমোশন পেয়েছি। আমাদের ক্লাসের চারজন প্রমোশন পায় নি, তার মধ্যে দাশরথি একজন। দাশরথির জন্যে মনটা বিষণ্ণ হল। যদিও জানতাম ওর পরীক্ষায় পাস করা সম্ভব ছিল না, কারণ ক্লাসে সব বিষয়েই ও ছিল অত্যন্ত কাঁচা। পরীক্ষার পড়ায় ও একেবারেই মন দেয়নি। আর দেবেই বা কেন। ওর ঝোঁক ছিল কবিতা লেখার আর সেই জন্যই ওর শান্তিনিকেতনে আসা। পরীক্ষা পাসের জন্যে নয়।

পরদিনই আমরা আদ্যবিভাগের একদল ছেলে চলে গেলাম দুমকায় একস্‌কারশনে। যাবার উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত থাকায় দাশরথির আর কোনো খোঁজ নিতে পারিনি, পরীক্ষায় অসাফল্যে সহানুভূতি জানানো, সে-সুযোগও আমরা আর পাই নি।

সাতদিন পরে আশ্রমে ফিরে এসে শুনলাম দাশরথি দেশে চলে গেছে। নায়েব এসে ওর জিনিসপত্র বিছানা বাক্স সব নিয়ে গেছেন। দাশরথি আর শান্তিনিকেতনে ফিরে আসবে না। এ-সংবাদ শুনে অনুশোচনা হল। ওর সঙ্গে হয়তো জীবনে আর দেখা হবে না। কিন্তু ওর জীবনের একটা প্রধান আকাঙ্ক্ষাকে আমরা আমল দিইনি, অনুশোচনা সেই কারণেই। এর পরেও আমরা সাহিত্যসভার আয়োজন করেছি, হাতে লেখা পত্রিকাও প্রকাশ করেছি। দাশরথির জন্য একটা অপরাধবোধ সবসময়ই আমাদের মনকে পীড়িত করত। কালের গর্ভে সবই বিলীন হয়, দাশরথির কথাও একদিন আমাদের মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেল।

শান্তিনিকেতন স্কুলে ছাত্রজীবনের যে কাহিনী এতক্ষণ আপনাদের বলে এসেছি সেটা ছিল ১৯২৮ সাল। কালের স্রোতে ইতিমধ্যে অনেকগুলি বছর পার হয়ে গিয়েছে। ষোলো বৎসর পর ১৯৪৪ সালের আরেকটি কাহিনী এবার আমি আপনাদের কাছে বলব।

বর্মন স্ট্রীটে দেশ পত্রিকার ঘরে তখন আমাদের প্রায়ই সান্ধ্য আসর বসত। সারাদিনের কাজকর্ম শেষ করে সাহিত্যিক বন্ধুরা একে একে এসে উপস্থিত হতেন। আমাদের সেই আসরের কথা 'সম্পাদকের বৈঠক' গ্রন্থে একাধিকবার আমি বলেছি—এখানে আর তার পুনরাবৃত্তি করতে চাইনে।

১৯৪৪ সালের এক সন্ধ্যায় দেশ পত্রিকার ঘরে একে একে সবাই উপস্থিত। সেদিন ছিল ২রা বৈশাখ। তার আগের দিন নববর্ষ উপলক্ষে আমরা একদল গিয়েছিলাম লেখক প্রভাত দেবসরকারের গ্রামে, গ্রামের নাম মালা। বজবজের রাস্তায় যেতে পথে এই গ্রামটি পড়ে। প্রভাতরা এই গ্রামেরই জমিদার, কিন্তু আজ সে গ্রামেরও দশা মুমূর্ষু প্রায়, জমিদারীর অবস্থাও অনেক সরিকের ভাগাভাগিতে একই অবস্থা। পূজা মণ্ডপ আছে, ঠাকুর-দালান আছে, অন্দরমহল বহির্মহলও আছে কিন্তু তা আছে জরাজীর্ণ অবস্থায়। গ্রামে নববর্ষ উৎসব পালনের জন্য প্রভাত ঠিক করেছিল একদল সাহিত্যিককে নিয়ে যাবে। শর্ত ছিল, যে-কজনকে নিয়ে যাবে তাদের প্রত্যেককে পুকুর থেকে ধরা রুই মাছের একেকটি মুড়ো খাওয়াবে।

নববর্ষের দিন সকালে এক স্টেশন ওয়াগন ভর্তি করে আমাদের জন বারো সাহিত্যিককে নিয়ে গেল মালায়। দলপতি ছিলেন স্বয়ং তারাশঙ্করবাবু। সঙ্গে ছিলাম সুবোধ ঘোষ, নরেন মিত্র, বিমল মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সুশীল রায়, মন্মথনাথ সান্ন্যাল, যতীন্দ্র

সেন, রমাপদ চৌধুরী আর আমি। প্রভাত আগের দিনই সব বন্দোবস্ত করবার জন্য গ্রামে চলে গিয়েছিল।

বজবজ লাইনের একটা রেল স্টেশনে এসে আমাদের গাড়ি থামল। তখন হবে বেলা ৯টা। সেখান থেকে মেঠো রাস্তায় মাইল দেড়েক হাঁটাপথ পার হয়ে গ্রামে ঢুকতে হবে। আমরা শহুরে মানুষ, বৈশাখের প্রচণ্ড রোদে দীর্ঘ পথ হাঁটায় অভ্যস্ত ছিলাম না। এই মাথাফাটা রোদে এতখানি দীর্ঘ পথ হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে প্রভাতের মুণ্ডপাত করতে করতে আমরা যখন মালা গ্রামে গিয়ে পৌছই তখন দেখি প্রভাত কয়েক কাঁদি কচি ডাব পাড়িয়ে সহাস্যবদনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। যাওয়ামাত্র একেকজনের হাতে একেকটি করে ডাব ধরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের উপর এতক্ষণ যে কটূক্তি বর্ষণ করছিলাম তা প্রশস্তিতে পরিণত হল। তাকিয়া আর ফরাস পাতা বৈঠকখানা ঘরে প্রভাত আমাদের সবাইকে নিয়ে বসালে—সঙ্গে সঙ্গে এলো চা সহযোগে জলখাবার। খাঁটি গ্রামের জিনিস, ছাঁচে তৈরী নারকেলের সন্দেশ আর টাটকা মুড়ি। সোল্লাসে জলখাবার সেরে আমরা গ্রাম পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়লাম।

দুপুরে ভূরি-ভোজন চণ্ডিমণ্ডপের দাওয়ায়। প্রভাত তার শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। প্রত্যেকের পাতে একটি করে আস্ত মাছের মুড়ো!

পরের দিন সন্ধ্যায় দেশ পত্রিকার আপিসে সমবেত সাহিত্যিকদের আড্ডায় সেই নিয়েই রসালো আলোচনা চলছিল।

আমি বললাম—'প্রভাত কিন্তু কথা ঠিকই রেখেছে। প্রত্যেককে মাছের মুড়ো খাইয়েছে।'

আত্মপ্রসাদের সঙ্গে প্রভাত বললে—'জানো, তোমাদের আপ্যায়ন করতে গিয়ে আমার কী হয়রানি। ভোর চারটেয়

গ্রামের জেলেদের বাবা বাছা বলে তোয়াজ করে তিন তিনটা পুকুরে ঘণ্টা চারেক ধরে জাল ফেলিয়ে তবে এতগুলি মাছ উদ্ধার করতে পেরেছি। এত ঝঞ্ঝাট হবে জানলে কোন শালা আর তোমাদের মত সাহিত্যিকদের নিয়ে যেত।'

সুশীল রায় চুপ করে থাকার পাত্র নন। প্রতিবাদ করে বললেন—'মাছের মুড়ো খাওয়ার লোভ দেখিয়ে এক ওয়াগন ভর্তি সাহিত্যিককে জমিদারী দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলে। আমাদের শুভাগমনে গ্রামে যে তোমার প্রেস্টিজ বেড়ে গেল তার মূল্য কি শুধু ওই মাছের মুড়ো? তাও আমার পাতে যেটা পড়েছিল সেটাতো রুইয়ের বাচ্চার মাথা।'

বিমল মিত্র সুশীলবাবুকে বললেন—'সব মাছের মাথাই যে এক রকম সাইজের হবে তা আপনি কি করে আশা করলেন।'

বিশুদা, বিশ্বনাথ মুখুজ্যে যাঁকে আমরা বরাবর না-লিখে-সাহিত্যিক বলে আখ্যা দিয়ে থাকি—তিনি সুশীল রায়ের কথা সমর্থন করে বললেন—'স্বীকার করছি সব মাছের মুড়ো এক আকারের হতে পারে না। কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করেছিলেন কি সবচেয়ে বড় দুটো মুড়ো বেছে বেছে দুজনের পাতে পড়েছিল?'

নীরেন চক্রবর্তী টিপ্পনী কেটে বললেন—'তা কি আর দেখিনি। সবচেয়ে বড় মাথাটা পড়ে ছিল মন্মথবাবুর পাতে আর তার পরের বড় সাইজটা পড়ল গিয়ে সাগরদার ভাগে।'

সুশীল রায় বললে—'তাহলে প্রভাত, তুমি পক্ষপাতিত্ব করেছো।'

বিমল মিত্র প্রভাতের পক্ষ নিয়ে বললেন—'প্রভাত কিছুমাত্র অন্যায় করে নি। সম্বৎসর লেখা ছাপাতে হবে। তদুপরি পূজা সংখ্যা, দোল সংখ্যা আছে। দুই সম্পাদককে তো ওর খুশী করা দরকার। একজন রবিবাসরীয় আনন্দবাজারের, অপরজন দেশ পত্রিকার।'

এ-কথায় ফোঁস করে উঠল প্রভাত। রাগে ফুলে উঠে বললে—'আমি কি নিজের হাতে পরিবেশন করেছি? পরিবেশন করেছিল আমাদের বাড়ির ঠাকুর। তার তো আর গল্প ছাপাবার দায় পড়ে নি।'

সুশীলবাবু ছাড়বার পাত্র নন। বললেন—'তোমার ঠাকুরকে নিশ্চয় তুমি বলে দিয়েছিলে যে খদ্দরের ধুতিপাঞ্জাবি পরা, মাথায় কাঁচাপাকা চুল বৃদ্ধটিকে বড় মুড়োটা আর ওই কোণায় বেঁটেমোটা লোকটিকে তার পরেরটা দেবে।'

এবার প্রভাত ক্ষেপে গিয়ে বললে—'আবার বলছি, কোন শালা আর তোমাদের মালায় নিয়ে যায়।'

বিশুদা মোলায়েম কণ্ঠে বললে—'এটা রাগারাগির ব্যাপার নয় প্রভাত।' এতগুলি সম্মানিত অতিথিকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে এরকম পক্ষপাতিত্ব করাটা কি তোমার উচিত হল? আরও পাঁচজন সাহিত্যিক ছিলেন, এমন কি তারাশঙ্করবাবু পর্যন্ত। তাঁরাই বা মনে মনে কি ভাবলো বলতো?'

নীরেন আবার ফোড়ন কেটে বললে—'প্রভাতদার এই পক্ষপাতিত্বের ফলে কেউ কেউ আঘাত পেয়েছেন বৈকি। মন্মথদার অ্যাসিস্টেণ্ট যতীন্দ্র সেন আমাকে ফেরবার সময় সারাপথ আক্ষেপ করে বলেছে, যে খেতে ভালোবাসে এবং খেতে পারে তাদের অবজ্ঞা করে বড় মুড়ো কিনা পড়ল বেছে বেছে স্বল্পাহারী দুজনের পাতে।'

যতীনবাবুর এই আক্ষেপের তবু মানে আছে। বিরাট বপু, আমাদের দশ জনের খাবার একাই নিঃশেষ করে দিতে পারেন। নীরেনের কথাটা আমরা কেউ হেসে উড়িয়ে দিই নি। যতীনবাবু যত্নসহকারে প্রত্যেক লেখকের লেখার প্রুফ দেখেন, বানান পাংচুয়েশন সংশোধন করে দেন। প্রয়োজন হলে লেখার ইমপ্রুভমেণ্ট-এর জন্য প্যারাগ্রাফ কেটে বাদ দেন আর নতুন

প্যারাগ্রাফ লিখে জুড়ে দেন। এ-হেন যতীন সেনকে উপেক্ষা করা প্রভাতের পক্ষে অন্যায়.বইকি।

এবার প্রভাত একটু মুষড়ে পড়ল। বললে—'যতীনবাবু খেতে ভালোবাসেন তা আমি জানি আর তারই জন্য দশ বারোটা মাছের টুকরো আমি নিজে ওঁর পাতে দিয়েছি। তবু যতীনবাবু এ-কথা বললেন? এ আমি বিশ্বাস করি না।'

প্রভাতকে চটিয়ে দিতে পারলে সুশীল রায় খুশি। বললে—'যাই বলো প্রভাত। তোমার উদ্দেশ্যটা কিন্তু ফাঁস হয়ে গিয়েছে।'

প্রভাত গুম হয়ে গিয়ে কটমট করে সুশীল রায়ের দিকে তাকালো। রেগে গেলে প্রভাতের মুখ দিয়ে কথাই বেরোয় না।

প্রভাতের মুখের এই থমথমে ভাবটা কাটাবার জন্যে বিমল মিত্র বললেন—'যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আর তর্ক করে লাভ কি। প্রভাতের যদি কিছু ত্রুটি ঘটে থাকে তা ইচ্ছাকৃত নয় এবং তা সংশোধনেরও উপায় আছে। কালী পুজোর সময় আবার আমরা মালা যাবো এবং সেখানে রাত্রি বাস করব। শুধু একটা আস্ত কচি পাঁটা হলেই হবে।'

এ-কথা শুনেই টেবিলের উপর প্রচণ্ড চাপড় মেরে প্রভাত বলে উঠলো—'কোন শা—'

'লা' পর্যন্ত আর প্রভাতকে বলতে হল না। ঘরের দরজার চৌকাঠে এক নবাগন্তুকের তম্মুহূর্তে আবির্ভাব। রাত তখন প্রায় আটটা বাজে। এ সময়ে দেশ পত্রিকার দপ্তরে নিতান্ত পরিচিত ব্যক্তি ছাড়া সচরাচর অচেনা ব্যক্তি কেউ আসে না। আসবার কারণও নেই। দপ্তরের কাজ বিকেল ছটাতেই বন্ধ হয়ে যায়, সুতরাং লেখা সংক্রান্ত ব্যাপারে নবাগতদের আসবার কথা নয়। আগন্তুক বোধহয় ঘরে এত লোক আশা করেনি তাই দরজার বাইরে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ইতস্তত করায় পর কর্কশ কণ্ঠে বললে—'ভিতরে আসতে পারি?'

আমি অপ্রস্তুত, অপ্রস্তুত আড্ডাধারী বন্ধুরা সবাই। সেদিন প্রভাতকে টার্গেট করে আড্ডাটা বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছিল, দিলে মাটি করে। গম্ভীর গলায় বিরক্ত কণ্ঠে আমি বললাম—'আসতে পারেন, আপনার কিছু বলবার আছে?'

আগন্তুক চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকলেন। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে গায়ে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা গরম কোট, পরনে পায়জামা। এক হাতে একটা কালো চামড়ায় বাঁধানো মোটা বই, সোনার জল দিয়ে ছোটো ছোটো অক্ষরে কী সব লেখা। অনুমান করলাম রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা হয়তো হবে। অপর হাতে বিরাট আকারের একটি চামড়ার সুটকেস। চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক রকমের ঘোলাটে ও রুক্ষ। ঘরে ঢুকেই একবার সেই চোখ আমাদের সকলের উপর বুলিয়ে নিয়ে আমার উপর নিবদ্ধ হল।

আমিও তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েই আছি। মনে হচ্ছে যেন চেনা মুখ কিন্তু কোথায় কবে দেখেছি তা আর স্মরণ আসছে না, নাম তো মনে করা দূরের ব্যাপার। এ-বিষয়ে আমার স্মৃতিশক্তি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এরকম একাধিকবার হয়েছে, রাস্তায় যেতে যেতে কেউ একজন নমস্কার করে বললেন—'এই যে সাগরবাবু, কেমন আছেন, ভালো তো? এইমাত্র বুঝি অফিস থেকে বেরোলেন, বাড়ি যাচ্ছেন তো?'

মাথা নাড়লাম, উত্তরও দিলাম, কিন্তু প্রশ্নকারী যে কে তা আর কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। আবার এমন নাছোড়-বান্দাও আছে দেখা হলেই প্রথম প্রশ্ন—'কী খবর, বহুদিন বাদে দেখা। চিনতে পারছেন? কে বলুন তো? চিনতে পারলেন না। সেই যে বাণীতীর্থ ক্লাবে আমরা একসঙ্গে রবীন্দ্র-জয়ন্তী করেছিলাম—এবার চিনতে পারছেন?'

চিনতে পারলাম না। তথাপি চোখে মুখে অকস্মাৎ চিনতে পারার বিস্ময় এনে বললাম—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার চিনেছি। আগের

চেয়ে একটু মোটা দেখাচ্ছে তাই চিনতে পারছিলাম না। তা কোথায় যাওয়া হচ্ছে? ট্রামে উঠতে পারলে হয় এখন।'

এই বলে এড়াবার চেষ্টা করছি কিন্তু ভদ্রলোক বললেন—'আমার নামটা মনে আছে তো? আমার নাম প্রদ্যুম্ন চট্টোপাধ্যায়। এবার চিনেছেন নিশ্চয়।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার চিনেছি। কতকাল পরে দেখা—'

এ রকম অপ্রস্তুতে আমাকে প্রায়ই পড়তে হয়। আজকের এই নবাগন্তককে দেখে আমার সেই একই অবস্থা। বয়েস ত্রিশ বত্রিশের বেশী নয়, আমাদেরই বয়েসী। যদিও বসবার মত খালি চেয়ার একটাও ছিল না, আমি বসতে দেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিনি। কিছু বলার থাকলে শুনে এক কথায় বিদেয় করে দেবার জন্য আমি উদগ্রীব।

আমার দিকে তখনো সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে। আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম। সাহিত্যিক বন্ধুরা সবাই চুপ। আগন্তুক বললে—'তুমিই তো সাগর।'

একেবারে নাম ধরে 'তুমি' করে যখন বলল তখন পরিচিত কেউ একজন নিশ্চয়। কিন্তু কোথায় দেখেছি, কবে দেখেছি কিছু মনে করতে পারছিলাম না।

তবু ভদ্রতার খাতিরে একটা কিছু জবাব দিতেই হয়। বললাম—হ্যাঁ আমিই, তুমি?'

'আমি দাশরথি। এবার চিনতে পেরেছো?'

দাশরথি! সেই কবি দাশরথি!! শান্তিনিকেতনে স্কুলের সতীর্থ দাশরথি!!! চেহারায় কৈশোরের লাবণ্য বিন্দুমাত্র নেই, রং আরো কালো হয়েছে। চোখের সেই কবিসুলভ ভাবালুতার পরিবর্তে রুক্ষ কঠোর দৃষ্টি। গায়ে গরম কোট, পরনে পায়জামা। চিনব কী করে। আমি বিস্মিত চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি, আমার মুখে কোনো কথা নেই।

দাশরথিই প্রথম কথা বলল—'মস্ত সম্পাদক এখন তুমি। এখন তো তোমার খুব নাম ডাক। অনেক নতুন লেখকদের তুমি নাকি আবিষ্কার করেছো, তাই তোমার কাছেই এলাম।'

আমি মনে মনে বিপদতারণ মধুসূদনের নাম জপছি। দাশরথি তার বুকের কাছে আঁকড়ে ধরা বাঁধানো বইটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—'আগে এইটে ছাখো।'

বইটা হাতে নিয়ে খুলে দেখি ও হরি। এতো সঞ্চয়িতা নয়। দাশরথির নিজের হাতে লেখা কবিতার খাতা, চামড়া দিয়ে সযত্নে বাঁধানো।

বইয়ের পাতাগুলি উল্টেপাল্টে দেখছি আর মনে মনে চিন্তা করছি কি বলে দাশরথিকে বিদায় করা যায়। ওদিকে আড্ডার বন্ধুরা উসখুস করছে, সকলেরই চোখেমুখে বিরক্তির ভাব—অসময়ে এ উৎপাত কেন।

খুবই মোলায়েম কণ্ঠে দাশরথিকে বললাম—। 'এত মোটা কবিতার খাতা, সব তো পড়বার সময় হয়ে উঠবে না, বরঞ্চ তুমিই এর থেকে গোটা দুই ছোটো কবিতা তোমার পছন্দ মতো বেছে নকল করে আমার নামে ডাকে পাঠিয়ে দিও।'

দাশরথি অবাক হয়ে বললে—'সে কখনো হয়? ডাকে পাঠাবো আর সঙ্গে সঙ্গে বাজে কাগজের ঝুড়িতে চলে যাবে। অনেক দূর থেকে এসেছি আজ রাত দশটায় পুরী প্যাসেঞ্জারে ফিরতে হবে। বাঁধানো খাতার কবিতাগুলি যদি পছন্দ না হয় স্যুটকেস ভর্তি অনেকগুলি কবিতার খাতা আছে তা-ও তোমাকে পড়ে শোনাতে পারি। বেশী চাই না, এক ঘণ্টা সময় দিলেই হবে।

দাশরথির চেহারা দেখেই আমার কেমন যেন মনে হল ওর মধ্যে এমন কিছু একটা ঘটে গেছে যে ওকে স্বাভাবিক অবস্থার মানুষ বলে চেনাই যায় না। দীর্ঘকাল পরে প্রথম

দর্শনে তাই আমি ওকে চিনতেই পারি নি। এই গরমের সময় গায়ে গরমের কোট; চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের তীক্ষ্ণ অথচ ঘোলাটে, হাতে কবিতার খাতা ভর্তি ট্রাঙ্ক। মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ অনুমান করেই আমি চেয়ার থেকে উঠে ঘরের অপর প্রান্তে যে খালি টেবিলটা রয়েছে সেখানে ওকে টেনে নিয়ে বসালাম।

আড্ডার বন্ধুরা তখন বেশ খানিকটা বিস্মিত চোখে আমাদের দুজনকে নিরীক্ষণ করে নিজেদের আলোচনায় মেতে উঠল, এদিকে আমি তখন দাশরথির মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। মনে পড়তে লাগল একের পর এক শান্তিনিকেতনে আমাদের ছাত্রজীবনের সেইসব দিনগুলি। কিন্তু দাশরথির মুখে কোনো ভাবান্তর নেই।

আমি ওকে একটু চাঙ্গা করে তুলবার জন্য বললাম, 'দাশরথি তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। চা কিংবা আর কিছু খাবে?'

দাশরথি এমন ভাব দেখাল যেন আমার কথা শুনতেই পায় নি। শুধু বললে—'আমাকে এখনই হাওড়ায় গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে। আমি শুধু জানতে এসেছি আমার কবিতা ছাপা হবে কি হবে না।'

একথার জবাব দিতে গেলে কিছুটা রূঢ় হতে হয়, ওকে নিরাশ করতে হয়। আমি তাই চুপ করে থাকাই সমীচীন বোধ করলাম।

আমার চোখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। পুব দিকের খোলা জানালা দিয়ে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা হতাশার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে—'কতকাল আর এই বোঝা বয়ে বেড়াব।'

দাশরথির কণ্ঠস্বর কেমন যেন বড় বেশী করুণ শোনালো। কৈশোর জীবনের সহপাঠীর সঙ্গে ষোলো বছর বাদে দেখা এবং সে

দেখার যে এ রকম পরিণতি হবে আমি তা কল্পনা করতে পারি নি। দাশরথি আর কোনো কথা না বলে এক হাতে কালো চামড়ায় বাঁধানো খাতাটা বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে অপর হাতে স্যুটকেস নিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, যাবার সময় সে আমার বুকের মধ্যে চাপিয়ে দিয়ে গেল অনুশোচনার এক জগদ্দল পাথর।

বিষণ্ণ চিত্তে আড্ডাধারী বন্ধুদের কাছে ফিরে এসে যখন দাশরথির এই অবস্থার কথা ভেবে অনুশোচনায় মুহ্যমান হয়ে চুপচাপ বসে আছি তখন কে একজন বলল—'আচ্ছা মানুষ তো আপনি। এতো আশা করে বাক্স ভর্তি কবিতা নিয়ে এসেছিল। একটা ছেপে দিলেই তো হত। তবে লোকটি যে অর্ধোন্মাদ তা ওর সাজপোশাক আর চাউনিতেই বোঝা গেছে।'

দাশরথির সঙ্গে আমার কৈশোর জীবনের পরিচয়ের সব ঘটনা বলার পর ওরা আমার বিমর্ষতার কারণ বুঝতে পারল। আমি অবশেষে বললাম—'দেখুন, ওর প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা অকৃপণ। খুবই অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। অথচ সরস্বতীই ওর প্রতি অকরুণ। শৈশব থেকেই ওর কবিতা লেখার প্রচণ্ড ঝোঁক, এ বয়সেও তার কামনা ও বাসনা—ও কবি হবে।' অথচ আমি জানি, ও কোনোদিনই তা হতে পারবে না। তাই বলছিলাম সরস্বতীর কৃপা থেকে ও বঞ্চিত।'

এর পরে আর আসর জমবার কথা নয়, সুর কেটে গিয়েছে। বিশুদা বললে—'প্রভাত, মাঝখান থেকে তুমি রেহাই পেয়ে গেলে।'

ক্ষেমাঘেন্নার সুরে প্রভাত বললে—'ঠিক আছে, কালীপুজোর তো এখনো অনেক দেরি। কথা দিচ্ছি, কালীপুজোর দিন রাত্রে মালায় নিয়ে গিয়ে তোমাদের কচি পাঁঠার মাংস খাওয়াব। তাহলে পক্ষপাতিত্বের অপবাদ থেকে রেহাই দেবে তো?'

প্রভাত সত্যি সত্যিই তার কথা রেখেছিল। কালীপুজোয়

মালা গ্রামে নিয়ে গিয়ে আমাদের কচি পাঁঠার মাংস খাইয়েছিল। সে আর এক বিরাট কাহিনী।

সেই যে একটা অনুশোচনা নিয়ে সেদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরেছিলাম, সারারাত তা কাঁটার মত আমাকে খোঁচা দিয়েছে। কত আশা নিয়ে দাশরথি তার বাল্যবন্ধুর কাছে এসেছিল। কিছুই নয়, একটা কবিতা ছেপে দেওয়া। কত লেখাই তো পত্রিকায় ছাপা হয়। তার মধ্যে একটা আধটা দাশরথির কবিতা চালিয়ে দেওয়া এমন কিছু নয় যে মহাভারত অশুদ্ধ হবে। বলা যায় না, হয়তো ওর মধ্যে সত্যিই কোনো প্রতিভা লুকিয়ে আছে যা জানার কোনো আগ্রহই দেখাই নি। দীর্ঘকালের অনলস চেষ্টা ও চর্চায় নিশ্চয় সে কিছু একটা শক্তি অর্জন করেছে, তা না হলে এ-ভাবে ও আমার কাছে ছুটে আসবে কেন। হয় তো ওকে ফিরিয়ে দিয়ে আমি ভুলই করেছি। মনে পড়ে গেল সেই বিখ্যাত কবিতার দুটি লাইন—'যেখানে পাইবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলেও পাইতে পার বিবিধ রতন।' দাশরথি ঘণ্টাখানেক কবিতা পড়ে শোনাতে চেয়েছিল। বলা যায় না, হয়তো ওর সেই সব কবিতার মধ্যেই একজন নতুন প্রতিভার সন্ধান পেয়ে যেতাম। সাহিত্যের ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে একাধিক। সমারসেট মম-এর প্রথম গল্প 'রেনস্' দশটা পত্রিকা থেকে ছাপার অযোগ্য বলে ফেরত এসেছিল। পরে ঐ একটি গল্পই মমকে বিশ্ববিখ্যাত করেছে—একটি গল্পই ওকে পাইয়ে দিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা। ন্যুট হ্যামসুনের কপালেও একই উপেক্ষা জুটেছিল তাঁর 'হাঙ্গার' বইয়ের পাণ্ডুলিপি নিয়ে, পরবর্তীকালে যে বই তাঁকে নোবেল পুরস্কার পাইয়ে দিয়েছে। পাণ্ডুলিপি হাতে ন্যুট হ্যামসুনকে বহু প্রকাশকের দরজায় ধরনা দিতে হয়েছে দিনের পরদিন। কেউ একটি পাতাও উল্টে দেখেনি। অর্বাচীন নতুন লেখক—তার

প্রথম বইয়ের পাণ্ডুলিপি। কার এত উৎসাহ আছে
ছাই-ভস্ম পড়ে সময় নষ্ট করবার। সময়ের অভাবের অ
একে একে ছয়টি প্রকাশক ন্যুট হ্যামসুনকে ফিরিয়ে দিং
অবশেষে মরিয়া হয়ে ন্যুট হ্যামসুন এক অখ্যাত প্রকাশকের কাছে
পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে গিয়ে কাতরভাবে অনুরোধ জানালেন যে
একবার যেন পড়ে দেখেন।

প্রকাশকের সেই এক কথা। 'না মশাই, নতুন লেখকের আনকোরা নতুন বই ছাপার রিস্ক আমরা নিতে পারব না। তাছাড়া যে বই আমরা ছাপাব না, যে-বই সম্পর্কে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই, তার পাণ্ডুলিপি পড়ে অযথা কেন সময় নষ্ট করতে যাব। আপনি ফেরত নিয়ে যান।'

ন্যুট হ্যামসুন এবার এসেছেন দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। বললেন—'পাণ্ডুলিপি আপনার টেবিলের এক কোণায় আপনি রেখে দিন। যদি কখনো কোনো দিন আপনার মনে কিছুমাত্র কৌতূহল দেখা দেয় যে এই পাণ্ডুলিপির মধ্যে কী আছে জানবার তাহলে একবার অন্তত অনুগ্রহ করে পৃষ্ঠাগুলি উল্টেপাল্টে দেখবেন। আর যদি কোনো আগ্রহ বা কৌতূহল না দেখা দেয় সমস্ত পাণ্ডুলিপি আপনি ছুঁড়ে ফেলে দেবেন আপনার বাজে কাগজের ঝুড়িতে।'

ন্যুট হ্যামসুন চলে গেলেন। তার মাসখানেক পরেই প্রকাশকের কাছ থেকে জরুরী তলব পড়ল ন্যুট হ্যামসুনের। ঐ একটি বই ছেপে প্রকাশক লাল হয়ে গেল, ন্যুট হ্যামসুন পেলেন বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

আমাদের দেশেও এরকম নজির আছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'র পাণ্ডুলিপি প্রবাসী পত্রিকায় ছ মাস পড়ে থাকার পর অমনোনীত হয়ে ফেরত গিয়েছিল—এ ঘটনা তো সকলেরই জানা।

দেশ পত্রিকার সম্পাদনা কাজে আমার নিজের জীবনেও অনুরূপ একটি অভিজ্ঞতার কথা এখানে বলছি। সে অভিজ্ঞতা আজকের দিনের প্রভূত জনপ্রিয় লেখক জরাসন্ধ সম্পর্কে। এ প্রসঙ্গে সে কাহিনীও আপনাদের কাছে বলে নিতে চাই।

হরিপদ রায় শান্তিনিকেতন কলেজে ছিল আমার সতীর্থ। বীরভূমের ছেলে, কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে সে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। সুন্দর গানের গলা। নিজেই এস্রাজ বাজিয়ে ভরাট সুরেলা গলায় সে যখন রবীন্দ্রনাথের গান গাইত আমরা মুগ্ধ হয়ে ওর গান শুনতাম। পড়াশুনো আর গান, এই ছিল ওর একমাত্র ধ্যান জ্ঞান ও কর্ম। আমাদের সঙ্গে ওর ভাব হয়ে গিয়েছিল অল্প সময়ের মধ্যেই। কলেজ জীবন পার হয়ে কে কোথায় ছিটকে পড়েছি। দেখা সাক্ষাৎ না হলেও আমি যে সাংবাদিকতাকেই আমার কর্মজীবনরূপে বেছে নিয়েছি এ খবর হরিপদ জানত, আমিও জানতাম যে বি-এ পাস করে হরিপদ জেল বিভাগে চাকরি নিয়ে এক জেলা থেকে আরেক জেলায় বদলির চাকরি করছে।

সেই হরিপদ হঠাৎ একদিন কলকাতায় এসে খোঁজখবর নিয়ে আমার বাড়িতে উপস্থিত। ও এখন ডেপুটি জেলারের পদে সিউড়ি থেকে বদলি হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে এসেছে। ওকে পেয়ে পুরনো দিনের স্মৃতিকথায় আমরা মশগুল হয়ে উঠলাম। আক্ষেপ করে হরিপদ বলল যে, জেলের চাকরি নিয়ে গান ও ছেড়ে দিয়েছে। আক্ষেপ আমারও কম নয়। হরিপদর ব্যারিটোন গলার গান আমার শুনতে বড় ভালো লাগত, সে সুযোগ আর হবে না।

কথায় কথায় হরিপদকে বললাম—'তুমি একটা কাজ করতে পারো? জেলের নানা রকমের কয়েদিদের নিয়ে তোমাদের কারবার। ওদের জীবনের ঘটনা নিয়ে কিছু লেখা যদি আমাকে দাও তাহলে আমি দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক ছাপব।'

অবাক হয়ে হরিপদ বললে—'তুমি তো ভাল করে জানো যে লেখাটেখা আমার দ্বারা কোনো কালে হবে না। সুতরাং আমার উপর তুমি ভরসা করো না।'

আমি বললাম—'বেশ, তুমি যদি না-ই লিখতে চাও, তোমাদের জেলে আরও তো অনেক কর্মী আছেন যাঁদের মধ্যে সাহিত্যের নেশা আছে। এমন একজনকে কি খুঁজে বার করতে পারো না?'

আমি কী ধরনের লেখায় উৎসাহী তা সবিস্তারে হরিপদকে বুঝিয়ে বলার পর ও বললো—'তোমার কথা শুনে ধারণা হল কী ধরনের লেখা তুমি চাও। আমি আমার পরিচিত দুচারজন সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলে যদি কোনো উপযুক্ত লেখকের সন্ধান করতে পারি, জানাবো।'

মাসখানেক বাদে হরিপদ আমার অফিসে এসে উপস্থিত। সঙ্গে একজন সুট পরা মাঝ বয়সী ভদ্রলোক, গায়ের রং কালো কিন্তু অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান ও লম্বা-চওড়া চেহারা।

পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললে—'ইনি মেজর গাঙ্গুলী, প্রেসিডেন্সি জেলের ডাক্তার। অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের সম্বন্ধে ইনি একটা লেখা নিয়ে এসেছেন, ওঁর লেখার নমুনা হিসেবে। যদি পছন্দ হয় তাহলে তোমার পরামর্শ অনুযায়ী বড় লেখায় হাত দিতে ইনি প্রস্তুত, তার জন্য মালমশলা সংগ্রহের কাজ ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছেন।'

উৎসাহিত হয়ে লেখাটি নিয়ে পড়ে ফেললাম, ভালো লেখা। লেখার সঙ্গে ওদের ফটোগ্রাফ দিতে পারলে ভালো হয়। সে-কথা জানাতেই মেজর গাঙ্গুলী বললেন—'আপনারা যদি ফটোগ্রাফার পাঠাতে পারেন আমি তোলার ব্যবস্থা করে দেব।'

কিছুদিন বাদেই দেশ পত্রিকায় সে লেখা প্রকাশিত হল।

এরপর একমাসও পার হয় নি, হরিপদ একদিন এসে দুঃসংবাদ দিল মেজর গাঙ্গুলী হঠাৎ করোনারী থ্রম্বোসিস হয়ে মারা গেছেন। হরিপদ আক্ষেপ করে বললে যে, কয়েদীদের মানসিক অবস্থা সহানুভূতির সঙ্গে বুঝবার চেষ্টা করতেন এবং উনি ছিলেন ওদের অকৃত্রিম দরদী বন্ধু।

এরপর দীর্ঘকাল হরিপদর সঙ্গে আর আমার যোগাযোগ নেই ; শুনেছিলাম যে কলকাতা থেকে বদলি হয়ে ও চলে গিয়েছে বহরমপুর জেলে।

বছরখানেক বাদে এক সন্ধ্যায় হরিপদ আমার আপিসে এসে হাজির। খুশী হলাম দেখে যে হরিপদ আমাকে ভোলেনি। হরিপদ বললে—'বহরমপুর জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই খাতাটা তোমাকে পড়বার জন্য আমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমি এতদিন ওঁরই আণ্ডারে জেলারের কাজে বহরমপুর ছিলুম, এবার বদলি হয়ে যাচ্ছি মেদিনীপুর জেলে। খাতাটা পড়া হয়ে গেলে তোমার মতামত আমাকে মেদিনীপুরে লিখে জানিও, আমিই ওঁকে জানিয়ে দেব।'

খাতাটা আমার জিম্মায় রেখে হরিপদ বিদায় নিল। এক্সারসাইজ বুক বাঁধানো মোটা খাতা। প্রথম পাতায় রচনার নাম লেখা আছে 'লৌহযবনিকা' লেখকের ছদ্মনাম 'বিশ্ববন্ধু'। লেখকের আসল নাম ঠিকানা কিছুই সে খাতার কোথাও লেখা নেই। লেখা সম্পর্কে খুব একটা কৌতূহল বোধ করলাম না। লেখা ও লেখকের নাম কোনোটাই আকর্ষণ করে নি। হরিপদ আমার সহপাঠী বন্ধু জেনে ওর উর্ধ্বতন কর্তা বোধ হয় ওর হাত দিয়ে লেখাটা গছিয়েছেন এরকমই একটা ধারণা নিয়ে খাতাটা আর পাঁচটা খাতার সঙ্গে ড্রয়ারে চালান দিলাম। চার পাঁচ মাস পর মেদিনীপুর থেকে হরিপদর এক পোস্টকার্ড এসে হাজির। কাতরভাবে লিখেছে সেই খাতার কথা, জানতে

চেয়েছে আমার মতামত। চিঠির শেষে অনুরোধ জানিয়েছে, যদি লেখাটা ছাপার যোগ্য বিবেচিত না হয় খাতাটা রেজেস্ট্রী করে ওর কাছে ফেরত পাঠাতে। পরে হরিপদ লোক মারফত লেখকের কাছে পাঠিয়ে দেবে।

সেই খাতাটার কথা আমি কিন্তু এতদিন বেমালুম ভুলে মেরে দিয়ে বসে আছি। তখন পত্রিকায় অন্যান্য ধারাবাহিক লেখার চাপ অত্যধিক ছিল বলে হরিপদর দেওয়া খাতার কথা আদপেই মনে ছিল না। হরিপদর চিঠি পড়ে মনে হল ও খুবই অস্বস্তির সঙ্গে অপ্রস্তুত হয়েই চিঠিটা লিখেছে। ওপরওয়ালার চাপও বোধ হয় এর অন্যতম কারণ। একটা কিছু উত্তর দিতেই হয়। জানি, এ খাতাটা ফেরতই পাঠাতে হবে। তবু সরাসরি 'পছন্দ হল না' বলে ফেরত পাঠাতে বিবেকে বাধল। যাই হোক, হরিপদ অনেক কালের বন্ধু, ওর কাছে মিথ্যাচার করা ঠিক হবে না।

ড্রয়ার খুলে অনেকগুলি পাণ্ডুলিপির তলা থেকে বোর্ড বাঁধানো এক্সারসাইজ বুক উদ্ধার করা গেল। লেখার 'লৌহ-যবনিকা' নামটা পড়ে একটা বিরূপ মনোভাব জেগে উঠল। সে সময়ে সোভিয়েট রাশিয়ার 'আয়রন কার্টেন' কথাটার সংবাদপত্রের বাংলা অনুবাদ 'লৌহযনিকা' ব্যবহৃত হত। সেই কারণেই বোধহয় কথাটার উপর আমার এতো অনীহা।

বিকেলের দিকে হাতের কাজ সারা। আড্ডার বন্ধুরা তখনো এসে হাজির হতে কিছু দেরি আছে। এই সময়ে খাতাটা টেনে নিয়ে বসেছি। দু-চার পাতা পড়েই তো বোঝা যাবে কী মাল। পরদিন সকালে আপিসে এসে হরিপদকে লিখে জানিয়ে দিলেই হল।

খাতাটার দু এক পাতা উল্টে দেখতে গিয়ে কখন যে এক ঘণ্টা সময় পার হয়ে গিয়েছে টের পাই নি। বিমল মিত্র ঘরে

ঢুকেই বললেন—'সে কি মশাই, কোথায় এলাম জমিয়ে আড্ডা দিতে আর আপনি পাণ্ডুলিপি নিয়ে তন্ময় হয়ে আছেন।'

খাতার পাতা থেকে মুখ না তুলেই বললাম—'বসুন, এই চ্যাপটারটা শেষ করে নিই।'

বিমলবাবু অগত্যা একটা খবরের কাগজ টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগলেন, আমার দৃষ্টি সেই খাতার পাতায় নিবদ্ধ।

চ্যাপটারটা শেষ করেই বললাম—'বিমলবাবু, পেয়ে গিয়েছি।'

বিমলবাবু বললেন—'আপনার একাগ্রচিত্তে পড়া দেখেই সেটা অনুমান করেছি। কী পেয়েছেন?'

'এতদিন যা খুঁজছিলাম তাই পেয়েছি। দেশ পত্রিকায় যখন ধারাবাহিক বেরোবে তখনই বুঝতে পারবেন।'

খাতাটা সেদিন সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে এলাম। শেষ পৃষ্ঠায় যখন এসেছি রাত তখন একটা।

পরদিন আপিসে গিয়েই হরিপদকে এই লেখার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিলাম। সেই সঙ্গে লিখে দিলাম ও যেন লেখককে অবিলম্বে জানিয়ে দেয় যে দিন পনেরো পরেই এ-লেখা দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে।

আমাদের অফিসের ফটোগ্রাফারকে বললাম আলীপুর সেন্ট্রাল জেল অথবা প্রেসিডেন্সী জেলের লোহার গারদ দেওয়া গেট-এর একটি ফটো তুলে আনতে। ফটোগ্রাফ এসে গেল, তার উপর আর্টিস্টকে দিয়ে লেখানো হল লৌহযবনিকার বদলে 'লৌহকপাট' এবং লেখকের ছদ্মনাম বিশ্ববন্ধুর জায়গায় দেওয়া হল 'জরাসন্ধ'।

পরের সপ্তাহেই দেশ পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় বক্স করে পববর্তী সপ্তাহ থেকে এ-লেখার ধারাবাহিক প্রকাশের সংবাদ প্রচারিত হল।

দাশরথি প্রসঙ্গে আমার সম্পাদক জীবনের এই অভিজ্ঞতার কাহিনী এখানে এইজন্যে উল্লেখ করলাম যে হরিপদ না থাকলে জরাসন্ধকে হয়তো আমি আবিষ্কার করতে পারতাম না—যিনি বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করে যশস্বী হয়েছেন। আমার অনুতাপ ও অনুশোচনা এই কারণেই যে, দাশরথিকে ওভাবে ফিরিয়ে না দিয়ে অন্তত একবার ওর কবিতার খাতাগুলি পড়ে দেখা উচিত ছিল। যা হবার তা তো হয়ে গেছে। এখন আর অনুতাপ করে লাভ কি। ভবিষ্যতে আর কোনো লেখককে এভাবে ফিরিয়ে না দেবার সঙ্কল্প নিয়ে অগত্যা নিজের মনকে প্রবোধ দিতে লাগলাম।

সম্পাদনা কাজে এই একটা নির্মম ও নিষ্ঠুর দিক আছে যা প্রায় কোনো সম্পাদকই এড়াতে পারেন না। কত উৎসাহ আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে লেখকরা দীর্ঘ দিনের চিন্তা ভাবনা আর পরিশ্রমে লেখা একটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি হাতে সম্পাদকের দরবারে উপস্থিত হন। অধিকাংশ নতুন লেখকের মনে আশা থাকে যে, একবার যদি পত্রিকায় তার লেখা ধারাবাহিক প্রকাশ করা যায় তাহলে বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন পড়ে যাবে। উচ্চাশা সব লেখকেরই থাকে, থাকা ভালও। কিন্তু লেখা প্রত্যাখ্যান করে সেই আশার মূলে যখন সম্পাদক কঠোর হাতে কুড়ুল মারেন তখন আশাহত লেখকের মনোবেদনা হয়তো তার হৃদয়কে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে না। এই অপ্রিয় কাজ সম্পাদককে প্রায়ই করতে হয় বলেই হতাশ লেখকের প্রতি কোনো অনুভূতিই আর থাকে না, হৃদয়ের এই কোমল দিকটা ততদিনে ভোঁতা হয়ে গেছে।

দাশরথির ক্ষেত্রে ঠিক এই ব্যাপারই ঘটেছিল। কতখানি আঘাত পেয়ে দাশরথি ফিরে গিয়েছিল তা সেদিন উপলব্ধি করিনি কিন্তু তার পরিণতি যা ঘটেছিল তা মর্মান্তিক। পত্রিকা

সম্পাদনা কাজে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় এর চেয়ে ট্র্যাজিক ঘটনা আমার জীবনে আর কখনো ঘটে নি।

আমার অফিস থেকে দাশরথির বিদায় নেবার দিন পনেরো পরে একদিন দুপুরে এক তরুণী দেশ পত্রিকার দপ্তরে এসে উপস্থিত। তন্বী শ্যামা, দোহারা চেহারা। বয়েস তেইশ চব্বিশের বেশি নয়। পরনে কালো পাড় তাঁতের শাড়ি, নিরাভরণা। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ, চোখ দুটি বুদ্ধিদীপ্ত। সঙ্গে যে বৃদ্ধটি এসেছেন তাঁকে দেখে আমি চমকে উঠেছি। ইনিই দাশরথির সেই নায়েব যিনি আম কমলালেবু আর সন্দেশ নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসতেন। বার্ধক্যের ভারে দেহ ভেঙে পড়েছে, মুখাকৃতির পরিবর্তন এমন বিশেষ কিছু হয় নি, যাতে চিনতে ভুল হয়।

আমি দুজনকেই চেয়ারে বসতে বললাম। তরুণীর মুখের ম্লান বিষণ্ণতা বড় করুণ লাগছিল, সঙ্কোচবশতই বোধহয় তিনি মুখ খোলেন নি।

নায়েব বললেন—'দাশরথিকে তো আপনি চিনতেন, ইনি তারই সহধর্মিণী। দিন দশেক আগে দাশরথি গিয়েছিল দীঘায়। যেদিন সেখানে পৌঁছেছে সেইদিন রাত্রেই সে আত্মহত্যা করেছে।'

এ খবর শুনে আমি স্তম্ভিত। আমার মুখে কোনো কথা নেই। তরুণীর দিকে তাকিয়ে দেখি ছলছল দৃষ্টি মাটির দিকে নিবদ্ধ। আমার বুকের ভিতর একটা চাপা দম বন্ধ করা হাহাকার গুমরে উঠছে। তাহলে আমিই কি অপরাধী? মেয়েটি কি সেই কারণেই আমার কাছে অভিযোগ নিয়ে এসেছেন? কিন্তু আমার আশঙ্কা দেখলাম অমূলক। এবার মেয়েটি সপ্রতিভ কণ্ঠে বললেন—'আমাদের আক্ষেপ তাঁর একটা কবিতার বই

ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করার সুযোগ পেলাম না। সমস্ত কবিতার খাতা তিনি নিজের হাতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে গেছেন। শুধু রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা একটি চিঠি আমাদের বিয়ের পর আমাকে সযত্নে রেখে দিতে বলেছিলেন, সেই চিঠিটি আজও আমার কাছেই আছে।'

একটু থেমে মেয়েটি আবার বললেন—'আচ্ছা আপনার কাছে কি উনি কোনো কবিতার খাতা রেখে গিয়েছেন ?'

—'না, কোনো খাতাই দাশরথি আমার কাছে রেখে যায় নি।' একথা বলার পর খানিকটা অপরাধীর মত অনুশোচনার সঙ্গে বললাম—'ও আমাকে কবিতা পড়ে শোনাতে চেয়েছিল কিন্তু অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম বলে সে সুযোগ ওকে আমি দিতে পারিনি। এই ত্রুটির জন্য কি আমি আপনাদের মার্জনা পেতে পারি ?'

অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে মেয়েটি বললেন—'ছি, ছি, আপনি ও কথা কেন বলছেন, আপনার তো কোনো ত্রুটি নেই। আপনি কি বলতে পারেন আপনার কাছে আসবার আগে উনি আর কোনো পত্রিকা অফিসে গিয়েছিলেন কিনা।'

এ খবর আমার জানা ছিল না, তাই কোনো সঠিক উত্তর দিতে পারিনি। আমার ধারণা, পুরানো পরিচিত বলেই সে আগ্রহ নিয়ে আমার কাছেই শুধু এসেছিল, আর কারো কাছে যায় নি।

খানিক নীরবতার পর একটা হতাশার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে দাশরথির স্ত্রী বললেন—'আমরা এবার চলি। আমাদের ব্যক্তিগত দুঃখের কথা বলে হয়তো আপনাকে অপ্রস্তুতে ফেলেছি, ক্ষমা করবেন।'

নমস্কার জানিয়ে ওঁরা দুজনে উঠে পড়লেন। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেবার সময় বললাম—'আমার একটা অনুরোধ রাখবেন ?

যদি কখনো দাশরথির কোনো কবিতার খাতা উদ্ধার করতে পারেন আমাকে একটা খবর দেবেন।'

সে খবর আজ পর্যন্ত আমার কাছে আসেনি। দাশরথির প্রতি যে অবিচার আমি করেছিলাম তার প্রতিকারের সুযোগ আজও আমি পেলাম না, এ দুঃখ আমার কোনো দিন ঘুচবে না।

দুই দুর্বোধ্য কবি

শুনতে পাই আধুনিক কবিতা নাকি অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য। আমার কাছে কিন্তু ততোধিক দুর্বোধ্য সেইসব কবিতার লেখকরা। ত্রিশ থেকে চল্লিশের কোঠায় বয়েস, একাধিক আধুনিক কবির সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ পরিচয়ের অভিজ্ঞতা থেকে এ-কথা বলছি। বুঝি কিংবা না-ই বুঝি, আধুনিক কবিতার আমি একজন একনিষ্ঠ পাঠক। শুনেছি আজকালকার আধুনিক কবিরা নাকি তিরিক্ষি-তরুণের দল।

কথাটা আপাত সত্য হলেও আমার অভিজ্ঞতা অন্য রকম। এঁদের মত সজ্জন অমায়িক নিরহঙ্কার বিনয়ী, সাহিত্যের অপর ক্ষেত্রে বড় একটা দেখা যায় না। নিজেদের মধ্যে সদ্‌ভাবও খুব, ঝগড়াও হয়—এমন কি হাতাহাতি পর্যন্ত। কিন্তু যে-কোনো কাজে হাতে হাত ধরে দলবদ্ধ ভাবে এগিয়ে এঁরা আসবেনই। কবিতা ঘন্টিকী বা দৈনিকী প্রকাশের কাজ, বঙ্গ সংস্কৃতির মাঠে কবিতা মেলা, ওভারটুন হলে কবিতা পাঠ অথবা অগ্রজ প্রবীণ কবিকে সংবর্ধনার আয়োজন। এ-সব কাজে এঁরা সবাই একজোট। রেষারেষি আছে, ঈর্ষা নেই। খ্যাতির চেয়ে কুখ্যাতির প্রতি এঁদের তীব্র আকর্ষণ, এবং অল্প কুখ্যাতিতে এঁরা সন্তুষ্ট নন। ফাল্গুনীর চন্দ্রহাসের চেলাদের মত এঁরা পথেঘাটে তারস্বরে গান গেয়ে বেড়ান—"ভালো মানুষ নইরে মোরা, ভালো মানুষ নই। গুণের মধ্যে ঐ আমাদের, গুণের মধ্যে ঐ।"

এই সেদিন একজন কবি হতাশার নিশ্বাস ফেলে আমাকে বললে—'চাকরিটা ভাবছি ছেড়েই দেব।'

কবির বয়েস ত্রিশোর্ধে। এক বিদেশী কোম্পানীর পদস্থ

অফিসার, প্রায় দু-হাজার টাকার উপর মাইনে। সুনাম ও সম্মানের সঙ্গে পাকাপোক্ত চাকরি। বলে কি না চাকরিটা ছেড়ে দেবে? আমি হতবাক।

নির্বাক বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে বললে—'আপনি বুঝবেন না, চাকরি করা কী যন্ত্রণা। যে-কোনো কবির সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে চাকরি, আবার সে-চাকরি যদি কোট-প্যাণ্ট-টাই পরা চাকরি হয়।'

বুঝলাম। বিয়ে-থা করেনি, ঝাড়া হাত-পা। কিন্তু সংসারের অন্য দায় দায়িত্ব তো আছে? সে-কথার উত্তরে এক গাল হেসে বললে—'সে-পাট চুকে গেছে। ছোটো ভাইরা ভালো ভাবে পাস করে চাকরিতে ঢুকে পড়েছে এখন আমি দায়-মুক্ত।'

'কিন্তু তোমাদের কবিতার ত্রৈমাসিক পত্রিকাটার তা হলে কী হবে? সেই পোষ্যপুত্রটির চলবে কি করে?'

অম্লান বদনে বলে বসল—'ওর জন্যেই ত চাকিরটা ছাড়তে চাইছি। সময় ও মনোযোগ দিতে পারছি না বলে পত্রিকাটা কিরকম রীকেটি হয়ে পড়ছে দেখছেন না?'

'বেশ তো সুস্থ সবল করে তুলতে চাও ভালো কথা। কিন্তু ম্যাও ধরবে কে?'

এবারে কবির মুখে আত্মতৃপ্তির হাসি। বললে—'ও ভাবনা আর ভাবি না। পত্রিকার বিক্রি ভালই এবং ক্রমশই বাড়ছে। বিক্রি থেকে খরচ উঠে এলেই আমরা খুশী।'

ওরই সমবয়সী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু আরেকজন তরুণ কবি শ-দুই আড়াই টাকার একটা যে-কোনো চাকরি পেলে বর্তে যায়। তার জন্য চেষ্টাও কম করে নি, এখনো করছে। খবরের কাগজে সাপ্তাহিক বাঁধা লেখার বরাদ্দ নিয়েছে ঠেকো দিয়ে নিজেকে খাড়া রাখবার জন্যে। ওয়াণ্টেড কলাম দেখে চাকরির

দরখাস্ত করে হয়রান হয়ে এখন সে ক্লান্ত। সেলস্‌ম্যানের একটা চাকরির বিজ্ঞপ্তি দেখে বন্ধুরা পরামর্শ দিয়ে বললে—'চাকরিটা মনে হচ্ছে তোরই জন্য অপেক্ষা করছে। আপ্ল্যাই করে দে।'

সাহিত্য আকাদমিতে একজন সেলস্‌ম্যান নেবে, মাইনে আড়াইশ টাকা। আবেদন গেল, ইণ্টারভিউতে ডাকও পড়ল। চাকরিটা হল না। এম-এ পাস, ইওরোপ আমেরিকা ফেরত, তরুণ কবিদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য, তদুপরি গল্প উপন্যাস রম্যরচনায় সিদ্ধহস্ত। ইণ্টারভিউতে তাঁকে বলা হল—'ইউ আর টু গুড্‌ ফর দিস জব্‌। আমরা চাই সেল্‌স্‌ম্যান। আপনার মত একজন প্রতিষ্ঠাবান লেখক ও কবিকে দিয়ে সেলস্‌ম্যানের কাজ করালে যে আমাদেরই বদনাম।'

সুতরাং চাকরিটা সে পেল না। ভালো চাকরি নিয়ে গিয়েছিল আমেরিকায়। ন মাস থেকেই 'দু-ত্তোর চাকরি' বলে ফিরে এসেছে। ওখান থেকে আক্ষেপ করে প্রায়ই চিঠি লিখত—'ভালো লাগছে না, ভালো লাগছে না একেবারেই। দানাপানির লোভে সোনার খাঁচায় আর পড়ে থাকতে ভালো লাগছে না। কলকাতায় ফিরে গিয়ে সাহিত্য নিয়ে একটা তুলকালাম কাণ্ড না করতে পারলে শান্তি পাচ্ছিনে।'

সত্যি সত্যিই পালিয়ে এল কলকাতায়। সুদৃশ্য মনোরম ফ্ল্যাট, আধুনিক আরামের যাবতীয় ব্যবস্থা, কাবার্ড ভর্তি বিলিতি মদের সমারোহ, হাত বাড়ালেই বান্ধবী। মার্কিন দেশে নয় মাসের এই সুখের জীবনকে লাথি মেরে চলে এল কলকাতার শহরলিতে। এঁদো গলির সেই পুরানো দোতলার জরাজীর্ণ ছোট্টো ফ্ল্যাটে ফিরে এসে আরামের নিশ্বাস ছেড়ে এখন সে চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এরাই বাংলা দেশের আধুনিক কবি, এদের চরিত্র আমার কাছে আজও দুর্বোধ্য। (১৯৭৩)

থার্ডমাস্টার

আমি যে কাহিনী আজ আপনাদের কাছে বলতে বসেছি তা ভাগলপুরের হাইস্কুলের এক থার্ড মাস্টারকে নিয়ে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা নয়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক বনফুল, ওরফে বলাইদার জীবনের অভিজ্ঞতা।

এ কাহিনী শুরু করার আ'গে একটু ভূমিকার প্রয়োজন।

এবারের দেশ পত্রিকা পূজা সংখ্যার কাজ নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি। বিমল মিত্রের উপন্যাস যতখানি হবার কথা ছিল লিখতে লিখতে নাকি এমনই জমে গেছে যে আকার এখন দ্বিগুণে পরিণত হয়েছে। শঙ্করকে নিয়ে সমস্যা। উপন্যাসের কপি টিপে টিপে ছাড়ছে—কবে শেষ হবে, কত স্লিপ লিখবে তার কোনো হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে আর্টিস্ট পূর্ণেন্দু পত্রী এসে বসে আছে, উপন্যাসের ছবি আঁকার ভার তাঁর উপর। তাঁর অভিযোগ—সম্পূর্ণ উপন্যাসটা একবার পড়ে না ফেলতে পারলে ছবিই বা আঁকবে কী করে।

হক্ কথা। কিন্তু সময়? সে তো আর কারোর জন্য অপেক্ষা করবে না। সার্কুলেশন ম্যানেজার শান্তি ভট্চায্ সাহেবী মেজাজের কড়া মানুষ। টাইপ করা নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন—৫ই অক্টোবর বিকেল ৫টার মধ্যে পূজা সংখ্যার সব ফর্মা ছাপা কম্প্লিট চাই। তাঁর বক্তব্য প্রায় এই রকম যে, যথানির্দিষ্ট সময়ে যদি ছাপা শেষ না হয় তাহলে কাগজ বিক্রির ভার যেন সম্পাদকরাই নেন।

পূর্ণেন্দু পত্রী বিরসবদনে বসে থেকে হতাশ হয়ে বললে—'উপন্যাসের শেষ পরিণতি না জানলে হেডপীস্ বা ভেতরের

ইলাস্ট্রেশন খানিকটা আন্দাজের উপর করতে হয়। সেটা কি উচিত?'

আবার সেই কথা, সময় কারো জন্যে অপেক্ষা করবে না। উচিত অনুচিতের বিবেচনা এখন শিকেয় তোলা থাক।

পূর্ণেন্দু আবার বলল—'তাহলে এক কাজ করুন। টেলিফোন করে জেনে নিন উপন্যাস কীভাবে শেষ করবেন। অন্তত ছকটা পেলে ছবি আঁকায় হাত দিতে পারি।'

সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন করে লেখককে শিল্পীর অভিপ্রায় জানিয়ে বললাম—'উপন্যাসের অর্ধেক পড়ে শিল্পী ছবি আঁকার তাগিদ পাচ্ছেন না। শেষ পরিণতি কী ভেবেছেন অন্তত সেটুকু যদি বলে দেন—'

অপর প্রান্ত থেকে টেলিফোনে উত্তর এলো—'সে কী মশাই, উপন্যাসের শেষ পরিণতি কী হবে আমিই বা জানব কি করে। আমি তো এখন পাত্র-পাত্রীদের হাতে মুঠোয়। তারা যেভাবে যেদিকে আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে সেইভাবেই আমাকে চলতে হবে। উপন্যাসের শেষ তো তাদেরই হাতে, আমার হাতে নয়।'

পূর্ণেন্দুকে লেখকের বক্তব্য জানিয়ে বললাম—'তাহলেই বোঝো। যে-টুকু হাতে পেয়েছ তার উপরেই কাজ শুরু করে দাও, সময় তো আর বসে থাকবে না।'

কথাটায় পূর্ণেন্দুর মন সায় দিল না। সে নিজেও লেখক, তদুপরি চিত্রশিল্পী। ওর মনের অবস্থা আমি বুঝি। তাছাড়া পূজা সংখ্যার কাজ, সুনাম দুর্নামের প্রশ্নও তো আছে।

দুজনেই গম্ভীর হয়ে বসে, দুজনেই চিন্তান্বিত। এমন সময় দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করলেন বনফুল, আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বলাইদা। বিরাট পুরুষ—কী চেহারায় কী ব্যক্তিত্বে। হাতে চেহারার সঙ্গে সঙ্গতি-রাখা বেতের লাঠি।

ওঁর এই হঠাৎ আবির্ভাবকে বলা যেতে পারে গদা হস্তে ভীমের প্রবেশ।

চেয়ারে বসেই লাঠিটা টেবিলের উপর আড়াআড়ি শুইয়ে রেখে পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে বললেন—'একটা গল্প লিখেছি, তোমাকে পড়ে শোনাই।'

যদিও আমাদের মনমেজাজ গল্প শোনার পক্ষে অনুকূল ছিল না, তবু বলাইদা হচ্ছেন বলাইদা। ওঁর এই শিশুসুলভ সারল্যকে আমি হিংসে করি। তাছাড়া জানি যে উপস্থিত আমাদের এই থমথমে পরিবেশ কিছুক্ষণের মধ্যেই গল্পগুজবে হাল্কা করে তুলবেন। সেই দিকেই আমার লোভ এবং সেইটুকুই আমার লাভ। তাছাড়া আমরা সবাই জানি বনফুলের ছোটোগল্প আক্ষরিক অর্থেই ছোটো, ছাপান আধপাতা কি পৌনে এক পাতার বেশী জায়গা নেয় না। সুতরাং আমরা আগ্রহ প্রকাশ করতেই পড়া শুরু করে দিলেন।

যে গল্প পড়লেন তা আর আমি এখানে বলতে চাই না, লেখকের প্রতি অবিচার করা হয়, অবিচার করা হবে যে-পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশিত হবে সেই পত্রিকার প্রতিও। তাছাড়া আমার বক্তব্য বিষয় তো বনফুলের লেখা গল্প নয়, তাঁর মুখে শোনা তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী। সে কথায় পরে আসছি।

দু-তিন মিনিটেই গল্প পড়া শেষ হয়ে গেল। বললেন—'গল্পটা লিখে খুব তৃপ্তি পেয়েছি। তাই ছুটে চলে এলাম তোমার কাছে। যাই বলো, গল্প ভালো হলে তোমাদের কাগজে ছেপে সুখ আছে।'

এটা অবশ্য আমাদের প্রতি অভাবনীয় সম্মান এবং তাঁর জন্য আমরা গৌরব বোধ করি। বিশেষ করে বনফুলের মতো প্রখ্যাত সাহিত্যিক যখন ৭১ বৎসর বয়স নিয়ে আমাদের দপ্তরে এসে গল্প

দিয়ে যান, সেটা আমাদের মর্যাদারই পরিচায়ক। তা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি নিশ্চয়।

বনফুলের মস্ত বড় একটা গুণ যে এই বয়সেও তিনি সব্যাসাচীর মত গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ব্যঙ্গরচনা দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ফসল সমৃদ্ধ করে চলেছেন। নিত্য নতুন বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি এখনো সমান আগ্রহী। তাঁর মন আজও সজাগ, লেখনী আজও সজীব। তাঁর চরিত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল তিনি তরুণ লেখকদের লেখার অত্যন্ত গুণগ্রাহী। যে-কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত কারো গল্প বা কবিতা পড়ে যদি ওঁর ভালো লেগে থাকে তিনি তা কখনো ভোলেন না। শুধু তাই নয়, পরিচিত জনের কাছে সে-কথা মুক্ত কণ্ঠে বলতে তাঁর কোনো সঙ্কোচ নেই।

সেই মুহূর্তেই সদ্য সদ্য তার পরিচয় পাওয়া গেল।

পূর্ণেন্দু পত্রী এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। ওর সঙ্গে যে বনফুলের আলাপ নেই সে খেয়াল আমার ছিল না। খেয়াল হতেই পরিচয় করিয়ে দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল হয়ে বললেন—'আরে, তুমিই পূর্ণেন্দু পত্রী। তোমার ছবির আমি মস্তবড় ভক্ত। তুমি বড়ে গোলাম আলীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে একটি কবিতা লিখেছিলে—সে কবিতা আমার মনে অসম্ভব নাড়া দিয়েছিল।'

পূর্ণেন্দুর সে কবিতা দেশ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল এবং তা আজও মনে আছে।

বিভিন্ন পত্রিকার পুজো সংখ্যার ছবি আঁকার কাজ নিয়ে পূর্ণেন্দু ব্যস্ত তাই গল্পগুজবে আর সময় নষ্ট না করে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

বলাইদা বললেন—'এক কাপ চা খাওয়াও দেখি চিনি ছাড়া।'

বুঝলাম বলাইদা এখন জমিয়ে গল্প করার মেজাজে আছেন

বেয়ারাকে ডেকে চায়ের কথা বলে দেবার পর বলাইদাকে বললাম—'এবারে শারদীয় আনন্দবাজারে আপনি যে উপন্যাস লিখেছেন, শুনলাম এক অসাধারণ নারী চরিত্র তুলে ধরেছেন ?'

বলাইদার মুখে শিশুর মত সরল হাসি। বললেন—'হ্যাঁ, একটি মেয়েকে নিয়েই এই উপন্যাস—রূপে গুণে আর্থিক স্বচ্ছলতায় যে-মেয়ে অভাবনীয় দাক্ষিণ্য পেয়েছে জীবনে সে কিন্তু সুখী হল না। যে-সমাজ, যে-পরিবেশে সে মানুষ, তাদের কারোর সঙ্গেই তার বনল না, একটা অগ্নি-বলয়ের মধ্যে পড়ে তাকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে।'

আমি প্রশ্ন করলাম—'এই জন্যেই উপন্যাসের নাম দিয়েছেন "রৌরব" ?'

—'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো। রৌরব মানে নরক, অর্থাৎ নরকাগ্নি।'

কথাটা বলেই হাসতে হাসতে বললেন—'মুশকিল কি হয়েছে জানো ? তোমার বৌদির অভিযোগ আমি নাকি উপন্যাসের এমন সব বিদ্‌ঘুটে নামকরণ করি যার অর্থ জানবার জন্যে ওঁকে সবাই ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। আমার 'নির্মোক' উপন্যাসের নামের অর্থ নিয়ে ওঁকে এই রকমই ফাঁপাদে পড়তে হয়েছিল। তাই ভেবেছি রৌরব নামটার বদলে 'সুরে মিলল না' নাম দিলে কেমন হয়।'

আমি প্রবল আপত্তি জানিয়ে বললাম—'আপনার উপন্যাসের নামের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। ও-সব আধুনিক চটুল নাম বেমানান।'

কথাটা বোধহয় মনঃপূত হল, রৌরব নামই রাখা স্থির করলেন।

চা এসে গেল। বলাইদা এখন কলকাতাবাসী, লেক

টাউনে বাড়ি কিনেছেন। কলকাতার প্রসঙ্গ তুলে বর্তমান রাজনীতি, আইন শৃঙ্খলা নানা বিষয়ে আলোচনা শুরু করলেন। ছাত্রদের কথা উঠতেই বলাইদা বললেন—'আমি কিন্তু এই উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে ছাত্রদের দোষ দিই না। আসল কথা কি জানো? আজকাল আদর্শ শিক্ষকের বড়ই অভাব। শিক্ষকরা বড়বেশী মার্সেনারী, ছাত্রদের সামনে বড় আদর্শ তাঁরা তুলে ধরতে পারছেন না।'

একথা বলেই বলাইদা তাঁর ছাত্রজীবনের একটি অভিজ্ঞতার কাহিনী বললেন—সে কাহিনী ভাগলপুর হাইস্কুলের এক থার্ড মাস্টারকে নিয়ে।

সেই কাহিনী আমি বলাইদার জবানীতেই আপনাদের শোনাতে বসেছি।

মনিহারীঘাটের প্রাইমারী স্কুল থেকে স্কলারশিপ নিয়ে ভাগলপুর হাইস্কুলে এসে ভর্তি হয়েছি। থাকি স্কুল ডর্মেটরিতে। স্কুলে তখন রীতি ছিল মাস্টারদের নাম ধরে না ডেকে থার্ড মাস্টার ফোর্থ মাস্টার বলে উল্লেখ করা।

এই থার্ড মাস্টার স্কুলে অঙ্ক বাংলা আর সংস্কৃত পড়াতেন, আমরা ওঁর কাছে শুধু অঙ্কের ক্লাস করতাম। ওঁর একটা বিশেষ গুণ ছিল—কোর্স কখনো ফেলে রাখতেন না। এরিথমেটিক অ্যালজেব্রা ও জিওমেট্রি—তিনখানা বই ক্লাসে পড়িয়ে শিখিয়ে শেষ করে বারংবার রিভাইস করাতেন—যাতে ওপরের ক্লাসে উঠে ছাত্রদের কোনো বেগ না পেতে হয়।

দিনের বেলা স্কুলে মাস্টারি করতেন, সন্ধেবেলা ওঁর কাজ ছিল স্কুল লাইব্রেরিতে গিয়ে বসা এবং ছেলেদের বই ইস্যু করা। ছেলেদের রুচি আগ্রহ আর উৎসাহের প্রতি লক্ষ্য রেখে থার্ড মাস্টার বই নির্বাচনে সাহায্য করতেন।

আমিও একদিন সন্ধ্যায় লাইব্রেরিতে গিয়েছি বই নিতে। থার্ড মাস্টারের সামনে উপস্থিত হয়ে আমার আকাঙ্ক্ষা জানাতেই উনি বললেন—'তুমিই তো মনিহারী থেকে স্কলারশিপ পেয়ে এসেছো, তাই না ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।'

আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন—'ইংরেজি গল্পের বই তুমি পড়ো। যাও তো, সামনের ঐ আলমারির উপরের তাকে বাঁদিকে প্রথম যে বইটা আছে ওটা নিয়ে এসো।'

আলমারি থেকে বইটা এনে দেখি বেশ মোটা বই, ডিকেন্সের অলিভার টুইস্ট।

থার্ড মাস্টার খাতায় আমার নাম বইয়ের নাম লিখতে লিখতে বললেন—'যাও, এই বইটাই পড়ো, সাতদিন বাদে ফেরত দেবে।'

বই নিয়ে ডর্মিটরিতে চলে এলাম। অতবড় একটা উপন্যাস তার উপর ইংরেজিতে লেখা। আমার বিদ্যে তখন আর কতটুকু। অনেক কসরৎ করে পনেরো-কুড়ি পাতা পড়ে রেখে দিলাম, দন্তস্ফুট করতে পারলাম না।

দু-তিন দিন পরে বইটা ফেরত দিতে গেছি, থার্ড মাস্টার বললেন—'সে কি, এরই মধ্যে বইটা পড়া হয়ে গেল ?'

আমি সসঙ্কোচে মাথা চুলকে বললাম—'স্যার, পড়বার চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার পক্ষে এ-ইংরেজি শক্ত বলে কুড়ি-পঁচিশ পাতার পর আর অগ্রসর হতে পারিনি। আমাকে বরং আপনি কিছু বাংলা বই দিন।'

তিনি কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—'তুমি ভয় পাচ্ছ কেন ? বুঝতে পারো আর না পারো পড়ে যাও। মনে করো, একটা নতুন অচেনা শহরের রাস্তা দিয়ে

তুমি চলেছ। কিছুই তোমার জানা নেই, তবু তুমি দেখতে দেখতে চলেছ। দৃষ্টিটা শুধু সজাগ রাখা চাই। পরে এই অচেনা শহর চেনা হয়ে যায়। তেমনি এ-বই তুমি পড়ে যাও। কিছু হয়তো বুঝলে, কিছু বুঝলে না। তবু কল্পনার দ্বারা মনের মধ্যে একটা কাহিনী তো গড়ে উঠবেই, সেটুকুই যথেষ্ট।'

এবার একটু থেমে কিছু একটা চিন্তা করে বললেন—'তা বাংলা বই যখন পড়তে চাইছ, তখন তাই পড়ো। যাও, বাঁদিকের আলমারির দ্বিতীয় তাকে আছে, বেছে নাও।'

আলমারির দ্বিতীয় তাকে ছিল দিনেশ সেনের লেখা বই—রামায়ণী কথা, বেহুলা ইত্যাদি। মনে আছে, তখনকার দিনে লাল কাপড়ের মলাট দেওয়া বই? সেই বই কিছুদিন নিলাম, কিন্তু একদিনেই একটা বই পড়া হয়ে যায়। শেষে অগত্যা থার্ড মাস্টারকে ইংরেজী বইয়ের কথাই বললাম।

খুশী হয়ে থার্ড মাস্টার আমাকে বেছে ডিকেন্স আর ওয়াল্টার স্কটের বইগুলি পড়তে দিলেন, কিন্তু একটা শর্তে। তিনি বললেন—'প্রত্যেকটি বই পড়ার পরে তুমি মূল কাহিনীটা বাংলায় লিখে ফেলবে।'

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম—'আমি পারব কি স্যার? ভুল যদি হয়—'

তিনি অভয় দিয়ে বললেন—'তার জন্যে ভাবনার কিছু নেই, ভুল হলে আমি সংশোধন করে দেব।'

এইভাবেই আমার বাংলা রচনার হাতেখড়ি। একটা বই পড়ে আমি তার গল্পটা আমার মতন করে বাংলায় লিখে ফেলি এবং প্রত্যেক ছুটির দিন সন্ধ্যায় থার্ড মাস্টার আমার ডর্মেটরিতে এসে সেই খাতা যত্নের সঙ্গে সংশোধন করে দিতেন—ভুলত্রুটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়ে দিতেন। একটানা চার বছর উনি আমাকে দিয়ে এ-ভাবে লিখিয়েছেন এবং সংশোধন

করেছেন। আজকের দিনে কোনো শিক্ষক নিঃস্বার্থভাবে এ-খাটুনি খাটবে?'

কাহিনীর এইখানে এসে বলাইদা থামলেন। থার্ড মাস্টারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর দুটি চোখ আপ্লুত। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—'সাহিত্যিক হিসাবে আজ যে-টুকু খ্যাতি আমি পেয়েছি তার পিছনে এরকম একটি শিক্ষকের চার বছরের অনলস পরিশ্রম কাজ করেছে। তাই আমি তাঁর কথা সর্বদা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।'

আমি উৎসুক আগ্রহ নিয়ে এ-কাহিনী শুনছিলাম। স্বভাবতই জানতে ইচ্ছে হয়, বলাইদার কৈশোর জীবনের সেই থার্ড মাস্টার বলাইদার পরবর্তী জীবনে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার পরিচয় পেয়েছিলেন কি না।

আমার প্রশ্নের উত্তরে বলাইদা আবার থার্ড মাস্টারের কাহিনীতে ফিরে গেলেন।

বললেন—

'তারপর বহু বছর কেটে গিয়েছে। আমি তখন ডাক্তারী পাস করে ভাগলপুরে প্র্যাকটিস করছি। বিবাহ হয়েছে, তখন আমি একটি কন্যা ও একটি পুত্রের পিতা। কি একটা উপলক্ষে আমাকে একবার সস্ত্রীক ভাগলপুরের বাইরে যেতে হয়েছিল। ফেরার পথে সাহেবগঞ্জ স্টেশনে এসে অপেক্ষা করছি, ভাগলপুরের ট্রেন আসতে বেশ কিছু দেরি আছে। আমার বড় ছেলে তখন কোলের শিশু। ওদের ওয়েটিং রুমে বসিয়ে রেখে আমি প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছি আর একটার পর একটা সিগারেট টেনে চলেছি। প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি জায়গায় যেখানে হুইলারের স্টলটা থাকে তার কাছাকাছি আসা মাত্র হঠাৎ একটা চেনা কণ্ঠস্বর কানে এল—'তুমি বলাই না?'

শোনামাত্রই মনে হল এ তো থার্ড মাস্টারের কণ্ঠস্বর।

সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কিন্তু কোথা থেকে যে ডাকটা এল তা হদিস করতে পারছিলাম না। হুইলারের কাঠের বাক্সটার কাছে এসে দেখি তারই আড়ালে একটা পুঁটলি মাথায় দিয়ে খালি শান বাঁধানো প্ল্যাটফর্মে শুয়ে আছেন আমার সেই থার্ড মাস্টার।

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললাম—'আপনি ঠিকই চিনতে পেরেছেন স্যার, আমি বলাই।'

ততক্ষণে উনি উঠে বসেছেন। চেহারায় প্রৌঢ়ত্বের ছাপ, কৃচ্ছ্রসাধনের ক্লান্তি কপালের রেখায় চোখে ও মুখে। পরম তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বললেন—'আমার ছাত্রদের আমি কখনো ভুলি না।'

থার্ড মাস্টার যাবেন রামপুরহাট, ওঁর ট্রেন আসতে তখনো মিনিট কুড়ি দেরি আছে। আমার ভাগলপুরের ট্রেন আসবে আরও পরে। আমার সম্পর্কে খুঁটিনাটি সংবাদাদি নেবার পর বললেন—

'তুমি যে 'বনফুল' ছদ্মনামে লেখো সে সংবাদ আমি পেয়েছি এবং তোমার লেখা নানা পত্রিকায় আমি প্রায়ই আগ্রহের সঙ্গে পড়ি। বিয়ে থা করেছো?'

আমি বিয়ে করেছি এবং আমার স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে এই স্টেশনের ওয়েটিংরুমেই আছে এই সংবাদ শুনে উৎফুল্ল হয়ে বললেন—'চলো, তোমার স্ত্রী ও ছেলেকে দেখে আসি।'

ওয়েটিংরুমে গিয়ে আমার স্ত্রী ও পুত্রকে দেখে থার্ড মাস্টার দুটি টাকা বার করে আমার ছেলের মুঠোয় গুঁজে দিলেন। আমার কোনোরকম আপত্তিই শুনলেন না। বললেন—'পৌত্রের মুখ দেখলাম যে, ওটা দিতেই হয়।'

আমার কিন্তু মনে মনে একটা সঙ্কোচ থেকে গেল, অযথা ওঁর দুটো টাকা খরচ করিয়ে দিলাম। বিনীতভাবে আমি বললাম

—'স্যার, আপনার টিকিট কাটা হয়েছে ?' পকেট থেকে একটা থার্ড ক্লাসের টিকিট বার করে দেখিয়ে বললেন—'হ্যাঁ, এইতো, রামপুরহাটের টিকিট।'

আমি জানি এই ট্রেনে থার্ড ক্লাসে প্রচণ্ড ভিড় হয়, দাঁড়িয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। আমি অনেক অনুনয় করে বললাম—'আপনার টিকিটটা আমাকে দিন, আমি সেকেণ্ড ক্লাসে বদলি করে আনি। থার্ড ক্লাসে ভিড়ে আপনার কষ্ট হবে।' আমার কথা উনি হেসেই উড়িয়ে দিলেন—'চিরকাল থার্ড ক্লাসেই আসা-যাওয়া করেছি। আমার ওতে কোনো কষ্ট হয় না।'

কিছুক্ষণ পরে ট্রেন এল। যা ভেবেছিলাম তাই। থার্ড ক্লাসে যত কুলি কামিন আর সাঁওতালদের ভিড়, দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত নেই। দ্বিধা না করে থার্ড মাস্টার পুঁটলি হাতে সেই ভিড় ঠেলে ভিতরে গিয়ে একহাতে বাঙ্ক ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন, বসবার জায়গাও পেলেন না।

আমি শেষ চেষ্টায় চিৎকার করে বললাম—'স্যার, এখনো সময় আছে। স্টেশন মাস্টার আমার পরিচিত, আপনার টিকিটটা এখন বদলে দিতে আমার কোনো অসুবিধা হবে না। আপনার কষ্ট হবে এভাবে যেতে।'

আমার কথায় কিছুমাত্র কান না দিয়ে শুধু হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন যে উনি এইভাবেই যাবেন এবং ওঁর কোনো কষ্টই হবে না।

এ-পর্যন্ত বলে বলাইদা থামলেন। থার্ড মাস্টারের বিদায় দৃশ্যটি বড় করুণ হয়ে ফুটে উঠল। বলাইদা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন—'জানো, বহু বৎসর পরে এই সেদিন ওঁর সঙ্গে আবার আমার দেখা এবং অপ্রত্যাশিতভাবে। কয়েক মাস আগে কান্দিতে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন হল—তোমার মনে আছে নিশ্চয়।

আমাকে সভাপতি করা হয়েছে এই খবর প্রকাশিত হবার পরে আমার কাছে একটা পোস্টকার্ড এসে হাজির। থার্ড মাস্টারের চিঠি।

কান্দিতে আমি বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে যাচ্ছি যেনে খুশী হয়ে উনি লিখেছেন যে ওঁর মেয়ে কান্দি গার্লস হাইস্কুলের হেডমিস্ট্রেস, এখন মেয়ের কাছেই আছেন। কান্দিতে গিয়ে আমি কোথায় উঠব জানালে আমার সঙ্গে এসে একবার দেখা করতে চান।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তরে জানিয়ে দিলাম, কোনদিন কখন আমি কান্দি পৌঁছচ্ছি এবং ওখানে গিয়ে আমিই ওঁর সঙ্গে দেখা করব।

যথানির্দিষ্ট দিনে সকালে কান্দি স্টেশনে পৌঁছেছি, সম্মেলনের উদ্যোক্তা যাঁরা আমাকে নিতে এসেছিলেন ট্রেন থেকে নেমেই তাঁদের বললাম, এখানকার গার্লস স্কুলের হেড মিস্ট্রেসের বাড়িতে আমাকে সর্বাগ্রে নিয়ে যেতে হবে—গুরুপ্রণাম সেরে তারপর অন্য কাজ।

হেড মিস্ট্রেসের বাড়ি পৌছে দেখি বারান্দায় একটি চেয়ারে আমারই অপেক্ষায় বসে আছেন আমার থার্ড মাস্টার। আমি প্রণাম করতেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দেহ অনেক কৃশ, বয়সের ভারে কিছুটা যেন দুর্বল মনে হল। কিন্তু চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি আর মুখের স্নিগ্ধ সৌম্য হাসি দেখে বোঝাই যায় না যে উনি আজ পঁচাশী বছরের বৃদ্ধ।

প্রথমেই আদেশ করলেন, রাত্রে ওঁর বাড়িতে এসে খেতে হবে। বললেন—'আমার আজও মনে আছে সেই ভাগলপুরে ডরমেটরিতে থাকতে তুমি কি কি খেতে ভালবাসতে। আমার মেয়ে নিজে বাজার করে এনেছে এবং সেইসব রান্না যা তুমি খেতে ভালোবাসতে ও নিজের হাতে তা রান্না করে খাওয়াবে। তুমি কথা দিয়ে যাও রাত্রে আমার এখানেই খাবে।'

কথা দিলাম একটি শর্তে, সে আয়োজন যেন খুবই সংক্ষিপ্ত হয়। রাত্রে গিয়ে দেখি বিরাট আয়োজন। শুধু মাছের তরকারীই চার রকমের—তার উপর অন্যান্য নানাবিধ ভাজাভুজি নিরামিষ তরকারী তো আছেই। আমি ছেলেবেলায় লাউ দিয়ে সোনামুগের ডাল খেতে ভালোবাসতাম—তাও দেখি রান্না হয়েছে।

আমি তো অবাক। থার্ড মাস্টারের মুখে পরিতৃপ্তির হাসি।

হীরের নাকছাবি

কালীঘাট ট্রামডিপোর উল্টোদিকে, ছোট্ট একটা চায়ের দোকানে আমরা কয়েকজন নিয়মিত আড্ডা জমাতুম। আমার সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা দক্ষিণ কলকাতাবাসী, তাঁরাই ছিলেন সে-আড্ডার নিত্যসঙ্গী। বিমল মিত্র থাকতেন কেওড়াতলায় কাঠের পুল পার হয়েই চেতলায়, রামাপদ চৌধুরী তখন থাকতেন ট্রাম ডিপোর উল্টোদিকে অমৃত ব্যানার্জি রোডে। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় টালিগঞ্জের চারু অ্যাভিনিউ থেকে মাঝে-মধ্যে এসে উদয় হতেন চায়ের নেশায় নয়, স্রেফ আড্ডার নেশায়। আর আসতেন সদানন্দ রোডের সদানন্দময় মানুষ বিশুদা, ওরফে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, যাঁর কথা আমি আমার 'সম্পাদকের বৈঠকে' গ্রন্থে একাধিক কাহিনীর নায়ক হিসেবে বারবার উল্লেখ করেছি। আমরা সবাই ছিলাম কিছু-কিঞ্চিৎ সাহিত্যের কারবারী। একমাত্র বিশুদাই ছিলেন ব্যতিক্রম। পেশায় ছিলেন ব্যাঙ্কের কেরানী কিন্তু সাহিত্যই ছিল তাঁর নেশা এবং সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর ছিল একটা প্রাণের যোগ। লেখকদের উৎসাহ দিতেন প্রচুর কিন্তু নিজে কিছুই লিখতেন না। সেই জন্যে আমরা ওঁকে বলতাম 'না-লিখে-সাহিত্যিক', কিন্তু আড্ডায় বিশুদাই ছিলেন মধ্যমণি।

যে যার কাজকর্ম সেরে ধড়াচুড়ো বদলে সন্ধে সাতটা থেকে সাড়ে সাতটায় চায়ের দোকানে এসে গোল শ্বেতপাথরের টেবিলটা অধিকার করে বসেই এক কাপ চা আর একটা মাংসের চপ বা কাটলেট অর্ডার দিয়ে দিতাম। প্রথম রাউণ্ডে ঐ অর্ডারের উপরেই আমরা ঘণ্টাখানেক সময় কাটিয়ে দিতাম।

ইতিমধ্যে চায়ের দোকানের সব টেবিল খদ্দেরের ভিড়ে ভর্তি, ছোটো ছোটো পর্দা-ফেলা কেবিনগুলো তরুণ-তরুণী অথবা সদ্য বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর অস্ফুট কলগুঞ্জনে মুখরিত। আমরা বসতাম বাইরে, রাস্তার দিকের দেওয়ালের আড়ালে রাখা গোল টেবিল-টায়, যাকে ঘিরে পাঁচ-ছ'টি চেয়ার গায়ে গা ঠেকিয়ে বসতে পারত। রাত সাড়ে আটটা ন'টা নাগাদ ভিড় একটু বেশি হলে অনেকে দোকানে ঢুকে খালি টেবিল-চেয়ার না পেয়ে হতাশ দৃষ্টিতে চারদিকে চোখ বুলিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে যেত এবং যাবার সময় আমাদের শূন্য চায়ের কাপের টেবিলটার দিকে একটু ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করত। ঘরের এককোণে ছোট্ট টেবিলটায় বসে দোকানের প্রৌঢ় বয়সী মালিক। আমাদের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই ছোকরা বেয়ারাকে কি ইশারা করতেন জানি না, সে এসে দ্বিতীয়বার তার টেবিল-মোছা ন্যাতাটা এনে আরেকবার টেবিলটা মুছতে শুরু করত। আমরাও ইঙ্গিতটা বুঝে ফেলতাম। অনেকক্ষণ টেবিল জুড়ে বসে আছেন, এবার কেটে পড়ুন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে আরেক রাউণ্ড চায়ের অর্ডার দিয়ে গ্যাট হয়ে বসে থাকতাম, উঠবার কোনো লক্ষণ দেখাতাম না। আরেক রাউণ্ড চা মানে আরো একঘণ্টা সময়। যখন দশটা বাজতো তখনও সেই এককাপ চায়ের কাপের উপরেই ঝড় বয়ে চলেছে—সাহিত্য নিয়ে তুমুল তর্ক তখন জমজমাট। হঠাৎ দেখি আমাদের মাথার উপরের ফ্যানটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বুঝলাম, এবার মালিকের এটা ফাইনাল নোটিশ! এবারেও যদি না উঠি তাহলে—

চায়ের দোকানে আমাদের এই সান্ধ্যকালীন আড্ডা নিত্য-নিয়মিত যে বসতো তা নয়। মাঝে-মধ্যে ছেদ পড়ত। কিন্তু প্রতি রবিবার সকালের আড্ডা খুব একটা জরুরী কারণ না ঘটলে ছেদ পড়ত না। সকাল ন'টার মধ্যেই আমরা জমায়েত

হতাম এবং আড্ডা চলত প্রায় বেলা একটা পর্যন্ত। রবিবার সকালের আড্ডায় প্রায়ই দু-একজন বাড়তি সাহিত্যিক এসে জুটত, যেমন শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় বা স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন টেবিল জোড়া দিয়ে আমাদের বসতে হয়, রাস্তার লোকদের দৃষ্টি আর এড়ানো যেত না। একবার অচিন্ত্যদা ট্রামে করে যাবার সময় আমাদের এই আড্ডা লক্ষ করে আমাদেরই এক পরিচিত বন্ধুর কাছে বলেছিলেন—এতগুলো লেখককে হাতে রাখবার জন্য সাগরের তো অনেক খরচ করতে হয়, কী বলো?

অচিন্ত্যদা অবশ্য জানতেন না যে আমাদের আড্ডায় সিস্টেমটা ছিল 'হিজ হিজ, হুজ হুজ'। চায়ের বিল যখন বেয়ারা এনে দিত, তখন সমান ভাগে ভাগ করে যে-যার পকেট থেকে টাকা বার করে দিয়ে দিতাম। পরবর্তীকালে পার্ক স্ট্রীট বা চৌরঙ্গীর হোটেল-রেস্তোরাঁয় সুনীল-সমরেশদের পানীয়ের আড্ডায়ও গিয়ে দেখেছি 'হিজ হিজ হুজ হুজ' সিস্টেমটা ওরাও চালু রেখেছে।

যাক, যে-কথা বলছিলাম। শীতকালের এক রবিবার সকালে ঠিক ন'টার সময় চায়ের দোকানে আমাদের নির্দিষ্ট টেবিলে গিয়ে বসেছি, অন্য কারুর দেখা নেই। একাই এক কাপ চা নিয়ে একঘণ্টা সময় দোকানের রাখা আনন্দবাজার পত্রিকাটা উল্টেপাল্টে পড়ে অবশেষে 'পাত্র-পাত্রী চাই' কলামটায় চোখ বুলোচ্ছি আর টেবিলের উপর একটা ডিশে রেখে-যাওয়া মৌরী চিবোচ্ছি, এমন সময় বিমল মিত্র, শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় আর বিশুদা এসে উপস্থিত। বিমলবাবুর মুখটা দেখলাম কিছু ব্যাজার, একটু মুষড়ে পড়া ভাব। শচীন আর বিশুদার মুখে কৌতুকের হাসি।

বিমলবাবু তখন 'দেশ' পত্রিকায় 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপন্যাস বৎসরাধিক কাল ধরে ধারাবাহিক লিখেছিলেন এবং

সেই সপ্তাহেই তাঁর উপন্যাসের শেষ কিস্তি ছাপা হয়েছে। প্রকাশক 'মিত্র ঘোষ'-এর সঙ্গে পূর্ব ব্যবস্থা অনুসারে উপন্যাসের প্রথম খণ্ড পুস্তকাকারে সেইদিনই প্রকাশিত হয়েছে। বিমলবাবুর তখন উপন্যাস-লেখক হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি।

চা আর চপের অর্ডার দিয়ে আমরা বেশ জমিয়ে বসেছি হঠাৎ বিমলবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'রবিবারের সকালটাই মাটি হয়ে গেল। ভাবছি কোন শালা আর লেখে।'

আমি তো অবাক। হলটা কী! বিশুদার মুখে তখনো মৃদু হাসি লেগে আছে, শচীন গম্ভীর।

কারণটা জানতে চাইলে বৃত্তান্ত যা শোনা গেল তা হচ্ছে এই—

ওঁরা তিনজনে একসঙ্গে গিয়েছিলেন প্রেমেনদার বাড়ি অভিনন্দন জানাতে। 'পদ্মশ্রী' পেয়েছেন তিনি, এঁরা তো তাঁর অনুজ লেখক, তাই তাঁকে অভিনন্দন জানাতে গিয়েছিলেন। ওঁরা যাওয়াতে খুব খুশি হলেন প্রেমেনদা। একেবারে দোতলায় তাঁর লেখাপড়ার ঘরে নিয়ে গিয়ে খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে আপ্যায়ন করলেন। কে কি লিখছে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করার পর হঠাৎ বিমলবাবুকে বললেন—

'বিমল, দেশ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে দেখলাম তোমার 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপন্যাসটার প্রথম খণ্ড বই আকারে বেরোচ্ছে। তা, তুমি ভালো করে এডিট্‌ করে দিয়েছো তো?'

বিমলবাবু প্রশ্নটা শুনে একটু ঘাবড়ে গেলেন। তাহলে কি দীর্ঘকাল ধরে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত উপন্যাসটি প্রেমেনদা ধৈর্যের সঙ্গে ধারাবাহিক পড়ে অনেক কিছু দোষ ত্রুটি খুঁজে পেয়েছেন? প্রেমেনদা যে একজন অত্যন্ত সচেতন পাঠক তা কে না জানে। নতুন লেখকদের লেখা সযত্নে পড়েন, শুধু তাই

নয়, লেখা ভালো হলে বাড়িতে ডেকে এনে অকুণ্ঠ প্রশংসা করে প্রচুর উৎসাহ দেন। আবার লেখার ত্রুটি দেখলে চুলচেরা সমালোচনা করে তাকে তা বুঝিয়ে দেন, উপদেশ দেন এবং কী করে আরো ভালো লিখতে হবে তার নির্দেশও দেন।

বিমলবাবু বললেন—না তো, আমি কিছুই এডিট করিনি। পত্রিকায় যা বেরিয়েছে বইয়ে তাই আছে।

একটিপ নস্যি নিয়ে রুমালে নাকটা মুছে প্রেমেনদা বললেন—ভুল করেছো বিমল, বইটা এডিট করে বার করলে ভালো করতে।

মন্তব্যটি বিমলবাবু সহজে মেনে নিতে পারলেন না। 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপন্যাসটির প্রস্তুতি চলছিল দীর্ঘকাল ধরে, যখন তিনি রেলে চাকরি করতেন সেই সময় থেকেই। উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্রই তাঁর নিজের চোখে দেখা। শুধু তাই নয়, নিজে যা দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন, সেই সঙ্গে প্রচুর পড়াশুনো করে তিনি এই উপন্যাসের আখ্যানবস্তু গড়ে তুলেছেন। তবু শিক্ষার্থী ছাত্রের মতো বিমলবাবু বললেন—কোন কোন জায়গায় এডিট করা উচিত ছিল আপনি যদি একটু বলে দেন তাহলে বিষয়টা ভেবে দেখতে পারি।

এবার ধরা পড়ে গেলেন প্রেমেনদা। অত বড় উপন্যাস সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতো ধৈর্য ধরে পড়বার সময় কোথায় তাঁর? শুধু উপন্যাসের আকার অনুমান করেই উপদেশটা দিয়েছিলেন, কিন্তু তার উত্তরে বিমল এরকম একটা বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসবে সেটা ভাবতেই পারেননি।

প্রেমেনদাও মিত্তির কায়েত। তাঁকে বেকায়দায় ফেলবে বিমল মিত্তির—তা কি কখনো হয়? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—

দ্যাখো বিমল, সত্যি কথা বলতে কি তোমার উপন্যাস

আমি একেবারেই পড়িনি। তবে তোমারই একজন অন্ধ ভক্ত পাঠকই আমাকে বলছিল যে উপন্যাসটা নাকি ভালোই লিখেছো তবে এডিট করলে আরো ভালো হত।

সঙ্গে সঙ্গে বিমলবাবু বললেন—ওটা যখন আপনার কথা নয় তখন আমি মানতে রাজি নই। বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডও প্রেসে দেওয়া হয়েছে, আমি একটি লাইনও তার বাদ দেব না।

এ কথা বলেই বিমলবাবু যাবার জন্য উঠে পড়লেন, সঙ্গে শচীন আর বিশুদাও। তবু উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করেননি প্রেমেনদা। বললেন—তবে একটা কথা স্বীকার করছি বিমল, 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' উপন্যাসের পর তোমার এই উপন্যাসটাই বাংলা সাহিত্যে 'বিগেস্ট নভেল'। এটা একটা বিরাট কীর্তি, সেটা মানতেই হবে।

এই বৃত্তান্ত শোনার পর আমি স্তম্ভিত। প্রেমেনদার কাছে আমিও তো প্রায়ই সকালে যাই এবং একটা টগবগে উৎসাহের ফুর্তি নিয়ে ফিরে আসি। বিমলবাবুর ক্ষেত্রে ঘটল বিপরীত প্রতিক্রিয়া। উনি বেশ খানিকটা মুষড়ে পড়েছিলেন প্রথম দিকে। ঘটনাটি সবিস্তারে আমার কাছে বলার পর এবার বেশ উত্তেজিত। বললেন—এই আপনাকে বলে রাখলুম সাগরবাবু, স্বাস্থ্যে যদি কুলোয় তাহলে এর জবাব আমি দেব আরো ভালো উপন্যাস লিখে এবং বড়ো উপন্যাস লিখেই।

ততক্ষণে দ্বিতীয় রাউণ্ড চা হয়ে গিয়েছে। বেলাও হয়েছে অনেক, প্রায় সাড়ে এগারোটা, এখন আরেক রাউণ্ড চায়ের অর্ডার না দিলে ছোকরা ন্যাতা এনে বারবার টেবিল মুছবে।

চায়ের অর্ডার দেওয়া হল। এবার মুখ খুললেন বিশুদা। বললেন—এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ে গেল দুই বাঁড়ুজ্যে লেখককে নিয়ে।

শচীন বললে—বাঁড়ুজ্যে লেখক ? কে বিশুদা, আমি তার মধ্যে নেই তো ?

—আরে না না। তুমি তো এখনো পোনামাছের চারা, তোমাকে নিয়ে গল্প তৈরী হবার সময় এখনো আসেনি। আমি বলছি বাংলা সাহিত্যের দুই রুই-কাতলাকে নিয়ে তারাশঙ্কর আর বিভূতিভূষণ।

বিশুদা সিগারেটে একটা জোর টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে দুই বাঁড়ুজ্যেকে নিয়ে সেদিন যে কাহিনী আমাদের রসিয়ে শুনিয়েছিলেন, আমি এখানে তার সারাংশটুকু তুলে দিলাম।

একদিন সকালে বেলা দশটা নাগাদ কলেজ স্ট্রীটে 'মিত্র ঘোষ'-এর দোকানে হন্তদন্ত হয়ে বিভূতিবাবু এসে হাজির। তখন উনি থাকতেন বনগ্রাম মহকুমার ব্যারাকপুর গ্রামে। শেয়ালদা স্টেশন থেকে সোজা চলে এসেছেন বইয়ের দোকানে, তাঁর পঞ্চাশটা টাকার প্রয়োজন। গজেনবাবু বললেন—বড়দা, এই মাত্র দোকান খুলেছি, ক্যাশে এখনো কিছু জমা পড়েনি। বিকেলের দিকে, এই চারটে সাড়ে চারটে নাগাদ পেলে চলবে কি ?

বিভূতিবাবু তাতেই রাজি। শুধু চিন্তায় পড়লেন সারা দুপুরটা তাহলে কী করবেন, কোথায় কাটাবেন। কাউকে কিছু না বলে দোকান থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে। সেখানে সার দিয়ে বসে থাকে চুল ছাঁটার নাপিত, ফুটপাতে ইঁটের উপর বসে চুল ছাঁটতে হয়। তাদের একজনকে ছয় আনার বদলে আট আনা দেবার কড়ারে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন গজেনবাবুর দোকানে। এসেই বললেন—গজেন, একটা টিনের চেয়ার আর একটা খবরের কাগজ দাও।

পাঞ্জাবিটা দোকানের ভিতরে খুলে রেখে গেঞ্জি গায়ে

রাস্তার উপর দোকানের দেয়াল ঘেঁষে টিনের চেয়ারে বসলেন, খবরের কাগজের মাঝখানটা ফুটো করে মাথা গলিয়ে দিলেন, যাতে গায়ে আর চুল না লাগে। দোকানের সবাই বিভূতিবাবুর কাণ্ড দেখে তাজ্জব।

চুল ছাঁটা চলছে এমন সময় গাড়ি করে তারাশঙ্করবাবু এসে হাজির। বিভূতিবাবুকে ঐ অবস্থায় দেখেই বললেন—সে কি হে বিভূতি, একটা সেলুনে গেলেই তো পারতে। একেবারে রাস্তার উপর বসে পড়লে ?

উত্তরে বিভূতিবাবু রাস্তায় বসে চুল ছাঁটার প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে তারাশঙ্করবাবুকে বললেন—হ্যাঁ ভাই তারাশঙ্কর, তোমার বাড়িতে আজ দুপুরে কী কী রান্না হয়েছে বলবে ?

প্রশ্ন শুনে তারাশঙ্করবাবুর অবাক। কি রান্না হয়েছে তা উনি কি করে জানবেন। প্রতিদিন বাজার করে ছেলে সনৎ, সুতরাং ওঁর তো জানবার কথা নয়। তবে হ্যাঁ, সকালবেলায় শুনে এসেছেন যে বাজারে ভালো গলদা চিংড়ি উঠেছে এবং সনৎ কিছু কিনেও এনেছে।

গলদা চিংড়ির কথা শুনেই বিভূতিবাবু বললেন—ভালই হয়েছে। তাহলে আজ দুপুরের আহারটা তোমার ওখানেই সারা যাক। কী বলো।

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন তারাশঙ্করবাবু। বললেন—সে তো উত্তম কথা। তুমি চুল ছেঁটে নাও, আমিও গজেনের সঙ্গে কাজের কথা সেরে নিই। তারপর বাড়ি গিয়ে বামনী যা রেঁধে দেবে দু-ভাই তাই ভাগ করে খাবো।

চুল ছাঁটা হয়ে গেল। দোকানের ভিতরে এসে পাঞ্জাবিটা পরেই তারাশঙ্করবাবুকে তাড়া দিলেন, গজেনবাবুকে বললেন—যোগাড় করে রেখো ভাই। বিকেল চারটের মধ্যেই এসে পড়ছি।

তারাশঙ্করবাবুর গাড়িতেই দুজনে চললেন টালায়। তারাশঙ্করবাবু তখন টালায় নিজের বাড়ি তৈরী করে বাগবাজার থেকে উঠে এসেছেন। হাতিবাগান আসতেই তারাশঙ্করবাবু গাড়ি থামিয়ে রামলালের দোকান থেকে এক ভাঁড় দই আর কিছু সন্দেশ কিনে নিলেন।

দুপুরে আহারটা বিভূতিবাবুর হয়েছিল ভালোই। বেগুন-ভাজা ও পটলভাজার সঙ্গে গাওয়া ঘি, লাউ দিয়ে সোনামুগের ডাল, বড়ি-চালকুমড়োর তরকারি আর গলদা চিংড়ির মালাই-কারি। দই সন্দেশ তো ছিলই।

খাওয়া-দাওয়ার পর এবারে বিভূতিবাবুর একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু তারাশঙ্করবাবু বিভূতিবাবুকে তাঁর একতলার বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গিয়ে সাহিত্যের আলোচনা শুরু করে দিলেন।

বিভূতিবাবুর লেখার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার পর বললেন—দেখো বিভূতি, তুমি কিন্তু একটা ভুল করছ। তুমি তোমার গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারছো না। দেখছো না আমাদের সমাজে কত পরিবর্তন ঘটে গেল। দাঙ্গা, মন্বন্তর, অতবড় এক যুদ্ধের আঁচ তো আমাদের গায়েও কম লাগেনি, যার ফলে রাতারাতি সমাজের চেহারাটাই দিলে পাল্টে, জীবনের মূল্যবোধ কী ভাবে বদলে যাচ্ছে তা কি তুমি বুঝতে পারছো না? যে-বিশ্বাস নিয়ে আমরা বড় হয়েছি, সে-বিশ্বাস আজ কীভাবে ভেঙে পড়ছে সে তো তুমি তোমার চারপাশে দেখতেই পাচ্ছো। তোমার কি উচিত নয় তোমার সাহিত্যে এসব কথা তুলে ধরা।

অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তারাশঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে বিভূতিবাবু বললেন—তুমি কি বলতে চাইছো তারাশঙ্কর। আমি যা লিখেছি তাহলে সেগুলি কি কিছুই হচ্ছে না?

—আমি তা বলতে চাইছি না বিভূতি। আমি বলতে চাইছি তোমার সাহিত্যে তুমি এখনো সেই গ্রাম আর নদী, সাঁই-বাবলার জঙ্গল আর অরণ্য, এই নিয়েই পড়ে আছো। এর থেকে তো তোমায় বৃহত্তর পটভূমিকায় বেরিয়ে আসতেই হবে।

তারাশঙ্করবাবুর অবশ্য এ-কথা বলবার অধিকার আছে। উনি তখন খ্যাতির তুঙ্গে। হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, মন্বন্তর, গণদেবতা বই তখন অভাবনীয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, ওঁর বইয়ের কাটতি তখন যে-কোনো সাহিত্যিকের কাছে ঈর্ষার কারণ।

বিভূতিবাবু কিন্তু তারাশঙ্করবাবুর যুক্তি মেনে নিতে পারলেন না। বললেন—আমি কোনো বড় ঘটনায় বিশ্বাসী নই, দৈনন্দিন ছোটখাটো সুখদুঃখের মধ্য দিয়ে যে জীবনধারা ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীর মত মন্থর বেগে অথচ পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ও আনন্দের সঙ্গে চলেছে—আসল জিনিসটা সেখানেই। আমি আমার গ্রামের চারপাশের প্রকৃতি আর মানুষদের মধ্যে এই জীবনটাই দেখি—বুঝি। আমার কথা তাদের নিয়েই। কোনো কৃত্রিম প্লট সাজানো, প্যাঁচ কষা, কৃত্রিম সিচুয়েশন তৈরী করা—আমি জানি না। সেই জন্যেই বোধহয় আমার কিছু হল না।

তারাশঙ্করবাবু সান্ত্বনা দেবার সুরে বললেন—না বিভূতি-ভূষণ, তোমার মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা আছে। শুধু যুগের সঙ্গে, কালের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হবে। তা যদি না পারো পিছিয়ে পড়বে তুমি।

আলোচনা যখন এই খাতে অনেক দূর গড়িয়েছে হঠাৎ বিভূতিবাবুর মনে সংশয় দেখা দিল। তাহলে আমি যা লিখছি তা কি সবই ভুল? সবই মুছে যাবে?

এই বিরাট প্রশ্নটা মনে নিয়ে তারাশঙ্করবাবুর বাড়ি থেকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লেন বিভূতিবাবু। টালা থেকে সোজা

চলে গেলেন টালিগঞ্জে। চারু অ্যাভিনিউতে থাকেন কালিদাস রায়। যাঁর সাহিত্যিক বিচারবোধের উপর বিভূতিবাবুর অসীম শ্রদ্ধা।

সৌভাগ্যের বিষয় কালিদাসদা সেদিন বাড়িতেই ছিলেন। উত্তেজিত বিভূতিবাবুকে দেখেই কালিদাসবাবু বললেন—কী হে বিভূতি, আবার কি হলো? হঠাৎ এ-সময়ে আমার কাছে?

তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে তাঁর যে আলোচনা হয়েছে তা সবিস্তারে কালিদাসদার কাছে পেশ করার পর বললেন—আচ্ছা দাদা, আপনিই বলুন, আমি কি ভুল পথে চলেছি? আমার লেখা কি সত্যিই মুছে যাবে?

কালিদাসদা স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ চিন্তান্বিত বিভূতিভূষণের অসহায় মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। পরে ধীরকণ্ঠে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—শোনো বিভূতিভূষণ, দেবী সরস্বতীকে তারাশঙ্কর গা-ভরা সোনার গয়না দিয়ে যতই সাজাক, তুমি দেবীর নাকের নাকছাবিতে যে হীরে বসিয়েছ তা দেবীর সারা অঙ্গের গয়নার জৌলুসকে ছাপিয়ে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তুমি যে-পথে চলেছো সেইটিই ঠিক পথ—সেইটিই তোমার ধর্ম। কখনো ধর্মচ্যুত হয়ো না।

যে-প্রশ্ন এতক্ষণ বিভূতিবাবুর মনকে আলোড়িত করে চলেছিল, কালিদাসদার এই কথায় তার উত্তর পেয়ে প্রশান্তিতে মন ভরে উঠলো। সহসা চেয়ার থেকে উঠে কালিদাসদার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললেন—চলি দাদা, আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে গেছি।

আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে সোজা চলে এলেন গজেন-বাবুর দোকানে। তখন বেলা শেষ, পাঁচটা বাজে।

গজেনবাবু বললেন—সে কি বড়দা, সারাদিন কোথায় ছিলেন? আপনি আসছেন না বলে আমরাও দোকানের ঝাঁপ

বন্ধ করতে পারছি না। আপনার জন্যে মুড়ি তেলেভাজা আনিয়ে রেখেছি, খাবেন তো ?

—নারে ভাই, তারাশঙ্কর আজ যা খাইয়েছে তারপরে আর কিছুই মুখে রুচবে না। খাবার ক্ষমতাও আমার নেই। দাও টাকাটা দাও, পাঁচটা পঞ্চান্নর বনগাঁ লোকালটা ধরতে না পারলে বাড়ি পৌঁছতে সেই রাত দশটা বেজে যাবে। তাছাড়া কল্যাণী বলে দিয়েছিল ফেরার সময় শেয়ালদা বাজার থেকে একটা কাশীর বেগুন যেন কিনে নিয়ে যাই।

এই বলেই বিভূতিবাবু গজেনবাবুর হাত থেকে টাকাটা নিয়ে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলেন শিয়ালদার দিকে।

বিশুদা যখন এই কাহিনী শেষ করলেন তখন বেলা প্রায় একটা। মাথার উপরের পাখাটা যে কখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে টেরও পাইনি।

মিটিংবাজের চিটিংবাজি

অনেকেই আমাকে বলেছেন যে, 'সম্পাদকের বৈঠকে' আর কেন আমি লিখছি না। এ প্রশ্ন আমি নিজেকেই অনেকবার করেছি। কেন লিখছি না? এর উত্তর এক কথায় বলা যায়—লিখতে পারছি না। কেন পারছি না, বিশদ করে আপনাদের বলি।

সাংবাদিকতা আর সম্পাদনা কাজে আমার দীর্ঘ চল্লিশ বছর কেটে গেল। শুরু করেছিলাম 'নবশক্তি' সাপ্তাহিক পত্রিকায়। তারপর তিন বছর 'যুগান্তর' পত্রিকার বার্তাবিভাগে কাটিয়ে সেই যে ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে 'দেশ' পত্রিকায় যোগ দিয়েছি, আজও সেই পত্রিকার সঙ্গে আমার জীবনের ভাগ্য এক চাকাতেই বাঁধা। বড়বাজারে বর্মন স্ট্রীটের নিভৃত কোণে দেশ পত্রিকার অফিসঘরটির স্মৃতি আমি আজও ভুলতে পারিনি। 'সম্পাদকের বৈঠকে' লেখার পিছনে সেদিনের স্মৃতিই আমাকে নিত্যনিয়ত উৎসাহ যুগিয়েছে। আটপৌরে একখানি ঘর, আকারে নিতান্তই ছোটো। দুখানা মাঝারি সাইজের টেবিল, খানকয়েক সংলগ্ন চেয়ার, গুটি তিনেক আলমারি। এই নিয়েই ঘর ভর্তি, আসবাবপত্রের আর কোনো বাহুল্য নেই। পূর্ব দিকের প্রশস্ত খোলা জানলা দিয়ে উন্মুক্ত আকাশ দু'চোখ ভরে দেখা যায়। জানলার ওপাশে একটি ছোটো অশ্বত্থগাছ, তার কচিপাতায় আলো আর হাওয়ার নাচন। সংবাদপত্রের কোলাহলমুখর কার্যালয়ের একপ্রান্তের এই নিরালা ঘরে সেদিন যাদের নিয়ে আমাদের বৈঠক বসত, তা'দের অধিকাংশই সাহিত্যের প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন তরুণ লেখক। কেউ রেল অফিসে নাইট শিফটে সদ্য

কাজে ঢুকেছেন, কেউ ব্যাঙ্কের সামান্য মাইনের কেরানী, কেউ সদ্য প্রতিষ্ঠিত দৈনিক কাগজের সাব্-এডিটর; মাসের পর মাস মাইনে না পেয়েও উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। আবার কেউ কোথাও কোনো চাকরি যোগাড় করতে না পেরে সামান্য পকেট খরচা রোজগারের জন্য সম্পাদকের ফরমাস মতন জার্নালিস্টিক লেখার যোগান দিচ্ছেন। সমাজে সেদিন এঁরা কেউই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না; সাংসারিক দায়িত্ব হয়তো তখনো তাঁদের কাছে জোয়াল হয়ে উঠেনি। যশ, মান, প্রতিষ্ঠা ও সচ্ছলতার সঙ্গে জীবনচর্যার এমন কতকগুলি পরিবর্তন আপনা থেকেই ঘটে যায়, যখন সময়ের সংকীর্ণতার সঙ্গে মানসিক প্রসারতারও সংকোচন ভিতরে ভিতরে কাজ করতে থাকে। এটা আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের চরিত্রগত দোষ বলে আমি মনে করিনে। আমি মনে করি, আমাদের দেশের লেখকদের এটা একটা বৈশিষ্ট্য। যূথবদ্ধ হয়ে সাহিত্যচর্চা আমাদের দেশের লেখকদের স্বভাববিরুদ্ধ, স্বাতন্ত্র্যেই তাঁদের স্বাভাবিক স্ফূর্তি। সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এই স্বাতন্ত্র্য আপনা থেকেই লেখকদের মধ্যে এসে যায়। তাঁরা তখন নিজ নিজ পরিবেশ অনুসারে খোলস রচনা করে নেন। সাহিত্যিক সমাজ বলে একটা কথা আছে। আমাদের দেশে এ-কথার কোনো তাৎপর্য নেই। যা আছে তা হচ্ছে দল এবং এই দল গড়ে ওঠে কোনো পত্রিকাকে কেন্দ্র করে অথবা কোনো পুস্তক প্রকাশককে অবলম্বন করে।

'দেশ' পত্রিকার আপিস ঘরে সেদিনের বৈঠকে যারা নিয়মিত আসতেন, আগেই বলেছি তাঁরা প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন লেখক হলেও তখনো প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হননি। গুটিপোকার মতো খোলস রচনা করে সাহিত্যের রেশম বোনার সাধনায় তাঁরা তখনো আত্মস্থ ছিলেন না। সারাদিন যে যার কাজ সেরে সন্ধ্যার দিকে জমায়েত হতেন। সে-যুগের বৈঠকের উপাদান ছিল যৎসামান্য।

তেলেভাজা অথবা মুড়ি, সেই সঙ্গে ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা। আসর সরগরম হয়ে উঠত, রাত কত হল সে-খেয়াল কারুর নেই। আড্ডার মধ্য দিয়েই পত্রিকার কাজ চলেছে, আড্ডাই ছিল পত্রিকার প্রাণ। বর্মন স্ট্রীটে অ্যাজবেস্টসের ছাতের তলায় ছোট্ট ঘরটি জন বারো তরুণ লেখকের গুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠত। আসরটি ছিল মৌচাকের মতো। মধু আহরণের কাজ এই বৈঠকের আড্ডার মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে চলত। সেদিনের এই সব অখ্যাত লেখকদের দল গল্প উপন্যাস কবিতা লিখে দেশ পত্রিকার রসদ যুগিয়েছেন। আবার এই মৌচাকে যদি কেউ ঢিল নিক্ষেপ করেছে, হুলের খোঁচাও তাকে কম সহ্য করতে হয়নি। সে সময়ে বিশেষ এক ধরনের রাজনীতিক মতবাদ নানা গলিঘুঁজির পথ ধরে বাংলার সাহিত্যিক মহলেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন, ফ্যাসিবিরোধী লেখক সঙ্ঘ ইত্যাদি নামের আড়ালে লেখকদের মধ্যে কমিউনিজম প্রচার ও প্রসারের এক গোপন অভিযান শুরু হয়েছিল। সে সময়ে বাংলার বহু খ্যাতিমান সাহিত্যিক এই চক্রান্তে প্রতারিত হয়ে এই দলে ভিড়েছিলেন, কিন্তু কিছুকাল বাদে এদের স্বরূপ চিনতে পেরে এই চক্রান্ত থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে আনতে পেরেছিলেন। যাঁরা পারেননি তাঁরা তাঁদের স্বাধীন শিল্পসত্তাকে এক ডগমার কাছে বিসর্জন দিয়ে আজীবন চরম যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন, অবশেষে মৃত্যু তাদের সেই মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছে। এ দৃষ্টান্ত বিদেশেও আছে, আমাদের দেশেও। সৌভাগ্যের বিষয়, বর্মন স্ট্রীটের সেই ছোট্ট ঘরের আসরে যে সাহিত্যিকরা সেদিন মিলিত হতেন তাঁরা কখনো কোনো ইজম-এর কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। অর্থ, হাততালি, প্রচারের বহু প্রলোভন তাঁদের কাছে এসেছিল, তাঁরা স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি, বিচলিতও না। আপন দেশকে তাঁরা ভালবাসেন, দেশের

মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও তার ব্যর্থতার কথাই ছিল তাঁদের সাহিত্যধর্ম। সেই ধর্মকে পরিহার করে তাঁরা কখনো ভয়াবহ পরধর্মে আত্মবিক্রয় করেননি।

'দেশ' পত্রিকার দপ্তরের ছোট্ট ঘরটিতে সেদিন যে বৈঠক নিত্যনিয়মিত বসত তার কথা তখন মুখে মুখে অনেকখানি প্রচার হয়ে গিয়েছিল। একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। একবার শরৎ-চন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে দেবানন্দপুরে আমাকে যেতে হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল দুটি। শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান, বাল্য ও কৈশোরের লীলাভূমি দেবানন্দপুর আমার কাছে তীর্থক্ষেত্র। এই উপলক্ষে সেই তীর্থের মাটিতে আমার প্রণাম নিবেদন করে আসা ছিল প্রথম উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, বৈঠকের বন্ধুদের সঙ্গে একটা দিন শহরের বাইরে আনন্দ করে কাটিয়ে আসা।

দেবানন্দপুরে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল সুধাংশুকুমার রায়-চৌধুরীর সঙ্গে, মিটিংবাজ সুধাংশুকুমার। 'মিটিংবাজ' বিশেষণটি আমার দেওয়া নয়, সে-সময় তিনি ঐ নামেই সাহিত্যিক মহলে পরিচিত ছিলেন। সদা-হাস্যময় বন্ধুবৎসল এই মানুষটির একমাত্র নেশা ছিল বাংলাদেশের মফস্বল শহরে ও পল্লী অঞ্চলে সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা এবং সেই সম্মেলনে নিজে প্রধান অতিথি, মূল সভাপতি, শাখা-সভাপতি ইত্যাদি কোনো-না-কোনো একটি নামে ভূষিত হয়ে সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া। সেই বক্তৃতাবলী পরে তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন, তার দাম ছিল পাঁচ টাকা এবং গ্রন্থের নাম ছিল 'সাহিত্য-সম্মেলনের বক্তৃতামালা'।

দেবানন্দপুর থেকে সন্ধ্যাকালে ফেরবার সময় ব্যাণ্ডেল ইস্টিশানে এসে দেখি গাড়িতে উঠবার জায়গা নেই। প্রচণ্ড ভিড়। এই ভিড়ে গুঁতোগুঁতি আমাদের ধাতে নেই, স্বভাবেও না। তাই পরের গাড়িতে যাওয়া স্থির করে ঠেলাঠেলি থেকে

গা বাঁচিয়ে প্ল্যাটফর্মের একপাশে আমরা কয়েকজন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ ঝড়ের মতো ছুটোছুটি করতে করতে সুধাংশুকুমার আমাদের সামনে এসে বললেন—'শীগগিরি চলে আসুন, একটা কামরা খালি পেয়েছি।'

পরোপকারী সুধাংশুবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল। ছুটলাম ওঁর পিছনে। কিছুদূর এগিয়ে গিয়েই একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় আমাদের প্রায় ঠেলে তুলে দিলেন, ট্রেনও ছাড়ল। কমপার্টমেণ্টে উঠেই আমাদের চক্ষুস্থির। বসবার জায়গা দূরে থাক, দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত নেই।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সুধাংশুবাবুর দিকে তাকাতে তিনি মুখে প্রাণ-জলকরা হাসি এনে বললেন—'কেন? উপরের দুটো বাঙ্ক একে-বারে খালি।'

কথা শেষ করেই এই মাঝবয়সী ক্ষীণদেহ মানুষটি তড়াক্ করে একটি বাঙ্কে ঘাড় গুঁজে উঠে পড়েই বললেন—'দাঁড়িয়ে কেন? উঠে আসুন।'

অগত্যা আমার সঙ্গীরা একে একে ওঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন। সঙ্গীদের কাণ্ডকারখানা দেখে আমি হতবাক্। অবশেষে আমাকেও কি এই স্থূল দেহ নিয়ে বাঙ্কে উঠে গুড়ের কলসী হয়ে বসে থাকতে হবে? সুধাংশুবাবু প্রচুর উৎসাহ দিয়ে বাঙ্কের উপর থেকে আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে বললেন—'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, উঠে আসুন।'

গাড়িভর্তি লোকের হাসির খোরাক দিয়ে টানা হ্যাঁচড়া ও ধস্তাধস্তির পর আমাকে বাঙ্কে তুলে দেওয়া হল এবং আমার সুবিধার্থে সঙ্গীরা আমাকে অর্ধশায়িত অবস্থায় পড়ে থাকবার সুযোগ করে দিলেন। কিন্তু মনে মনে আমি প্রমাদ গণলাম। পুরো একঘণ্টার পথ এই অবস্থায় আমাকে যেতে হবে! মিটিং-বাজ সুধাংশুবাবুর উপর আমার রাগ তখন সপ্তমে চড়েছে।

রাগলে আমি আবার কথা কম বলি। অন্য সবাই বাক্যালাপ শুরু করে দিয়েছে, আমিই শুধু নিরুত্তর।

আমার অবস্থা দেখে এবং বোধ হয় আমার মনোভাব বুঝতে পেরেই সুধাংশুবাবু বললেন—'এই জন্যেই আমি বলি কি, আপনারা কখনো এমন কোনো সভাসমিতির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন না যাতে সেই দিনই কলকাতায় ফিরে আসতে হয়।'

এ আবার কী কথা! আমাদের মধ্যে কে একজন বললো—'সে কি মশাই, কলকাতা ছেড়ে মফস্বল শহরে বা পাড়াগাঁয়ে কে রাত্রিবাস করতে চায়। মশার কামড়, ম্যালেরিয়া, দূষিত জল, টাইফয়েড—কতরকম রোগের জীবাণু সেখানে গিজগিজ করছে।'

সুধাংশুবাবু বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন—'হুঁঃ, আপনারা শুধু রোগ-জীবাণুই দেখলেন, কিন্তু দেখলেন না রাত্রিবাস করলে কত আদর-আপ্যায়ন, খাতির-যত্ন আর খাওয়া-দাওয়ার কী ডঙ্কা।'

এ-কথার পর সুধাংশুবাবুর উপর আমার যত রাগ জমে ছিল তা নিমেষে উবে গেল। আমি বললাম—'এই জন্যেই কি আপনি কলকাতার বাইরে এত সভাসমিতি করে বেড়ান?'

'নিশ্চয়, তা না হলে মজুরী পোষাবে কেন। আমি সেই জন্যেই এমন জায়গায় সাহিত্যসভার আয়োজন করি যেখান থেকে সভার পর আর রাত্রে কলকাতা ফিরবার গাড়ি পাওয়া যায় না।'

সুধাংশুবাবুকে তারিফ করে একজন বললে—'এটা তো ভালো বুদ্ধি বার করেছেন।'

'তা না করলে কি চলে? সভার শেষে রাত্রে যদি কলকাতা ফেরার গাড়ি থাকে তাহলে উদ্যোক্তারা কোনো রকমে একটু চা-সিঙাড়া মিষ্টি খাইয়ে তাড়াহুড়ো করে ট্রেনে তুলে দিতে পারলেই বেঁচে যায়।'

সুধাংশুবাবুর কথা শুনে গাড়ির মধ্যে তখন হাসির রোল উঠেছে। গাড়িভর্তি লোক ওঁর দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে।

আমি বললাম—'আচ্ছা সুধাংশুবাবু, বাংলাদেশের জেলায় জেলায় শহরে গ্রামে আপনি এত সাহিত্যসভায় যাবার নিমন্ত্রণ পানই বা কি করে। রহস্যটা আমাদের একটু বলবেন? তা হলে আমরাও চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

উৎফুল্ল হয়ে সুধাংশুবাবু বললেন—'আপনি যেতে চান? তা এতদিন আমায় বলেননি কেন? প্রধান অতিথি বা মূল সভাপতি করে না পারলেও নিদেনপক্ষে শাখা-সভাপতি করে আপনাকে আমি যে কোনো সাহিত্যসভায় নিয়ে যেতে পারি।'

আমি বললাম—'আমার যাওয়া-না-যাওয়াটা পরের কথা। আমি শুধু জানতে চাইছিলাম আপনার ট্রেড সিক্রেটটা কী।'

এ-কথার পর সুধাংশুবাবু একটু গম্ভীর হয়ে গাড়িভর্তি লোকগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। তারপর গলার স্বর একটু খাটো করে বললেন—'কাউকে যদি না বলেন তো বলি।'

আমার আশ্বাস পেয়ে বললেন—'আমার একটি নোটবুক আছে। তাতে বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলায় কোথায় কি সাহিত্য-সমিতি বা সভা আছে তার নাম ঠিকানা টোকা। দৈনিক পত্রিকার মফস্বল সংবাদ ঘেঁটেঘেঁটেই আমি নাম ঠিকানা সংগ্রহ করি। তারপর কোন জেলায় কোন সিজ্‌ন্ সভা-সমিতির পক্ষে প্রকৃষ্ট তা জেনে নিয়ে তাদের সঙ্গে চিঠিপত্র চালাচালি করি।'

আমাদের মধ্যে আরেকজন অধৈর্য হয়ে খোঁচা দিয়ে বললেন—'কলকাতায় এত সাহিত্যিক থাকতে আপনাকেই তারা শুধু নিয়ে যায়?'

শ্লেষটুকু গায়ে না মেখে হাসতে হাসতেই সুধাংশুবাবু বললেন—'আমাকে না নিয়ে গেলে তো উপায় নেই। প্রধান অতিথি বা মূল সভাপতি পাবে কোত্থেকে। টিকি তো আমার হাতে বাঁধা।'

অবাক হয়ে আমি বললাম—'প্রধান অতিথি বা সভাপতি বুঝি আপনিই নিয়মিত সাপ্লাই করেন ?'

'আসল কথা কি জানেন ? মফস্বল অঞ্চলের সাহিত্য-সমিতি-গুলির উদ্যোক্তারা অতি সরল লোক। কলকাতার সাহিত্যিকরা যে কী চীজ, তারা তো আর তা জানে না। এই সেদিন দুটি ছোকরা এসেছিল বাঁকুড়া থেকে। কলেজ লাইব্রেরীর বার্ষিক অনুষ্ঠানে একজন সাহিত্যিক সভাপতি নিয়ে যেতে চায়। তারাশঙ্করবাবু তখন লাভপুরে। তাঁকে না পেয়ে তারা গেল প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়ি। অনেকক্ষণ বসিয়ে গল্পগুজব করে প্রচুর উৎসাহ দিয়ে এবং যথারীতি চা খাইয়ে ছেলেদুটিকে বুঝিয়ে দিলেন যে, এত কাজের চাপ, একদিনের জন্যেও কলকাতার বাইরে যাবার উপায় নেই। প্রেমেনদা ওদের সদুপদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন প্রবোধ সান্যালের কাছে। ওরা গেল ঢাকুরিয়ায়। প্রথম সাক্ষাতেই প্রবোধদা ছেলেদুটিকে প্রশ্ন করলেন :

'আমার বাড়ির ঠিকানা কি করে পেলে ?'

'আজ্ঞে, প্রেমেন্দ্র মিত্রর কাছে গিয়েছিলাম, তিনিই আমাদের আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।'

'প্রেমেন যেতে চাইল না কেন ?'

'আজ্ঞে, ওঁর অনেক কাজ, তাই—'

ব্যস্, হয়ে গেল। প্রবোধদা কথা শেষ করতে না দিয়েই হুংকার দিয়ে উঠলেন—'প্রেমেন রিফিউজ করেছে বলেই বুঝি আমার কাছে এসেছো ! ওসব হবে-টবে না, আমারও অনেক কাজ।'

ফিরে আসতে হল ওদের। সারাদিন ধরে এক সাহিত্যিকের দরজা থেকে আরেক সাহিত্যিকের দরজায় ধরনা দিয়ে দিনের শেষে বিফল হয়ে তারা ফিরে গেল।

আমাদের মধ্যে কে একজন বললেন—'বাঁকুড়া থেকে

এসেছিল বলেই বেচারীদের হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হল। আসত যদি দার্জিলিং, শিলং, পুরী থেকে—'

উৎসাহ পেয়ে সুধাংশুবাবু বললেন—'এদের দুঃখ আমি ছাড়া আর কে বুঝবে বলুন! আমি তাই সারা বৎসর চিঠিপত্র লিখে প্রোগ্রাম ঠিক করে এক-একজন সাহিত্যিককে এক এক জায়গায় নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করি।'

আমি বললাম—'আপনি কলকাতার নামকরা লেখকদের রাজী করাতে পারেন?'

'পারব না কেন? সটান পায়ের উপর পড়ে বলি—দাদা, সঙ্গে আমি আছি, সব বন্দোবস্তর ভার আমার উপর। কোনো অসুবিধা, কোনো কষ্ট আমি হতে দেব না। আরামে নিয়ে যাব, আরামে ফিরিয়ে আনব। রাজী করিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উদ্যোক্তাদের লিখে দিই যে, অমুক সাহিত্যিককে নিয়ে যাচ্ছি। তবে হ্যাঁ, শর্ত একটা থাকেই।'

'শর্তটা কী শুনি?'

'শর্ত হচ্ছে, যাঁকে নিয়ে যাচ্ছি তাঁকে প্রধান অতিথি করতে হবে আর আমি হব সভাপতি। সুতরাং দু-জনের ফার্স্ট ক্লাস ভাড়া আর সভাপতির স্পীচ ছাপাবার জন্য পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম দেয়।'

এতক্ষণে সুধাংশুবাবুর মিটিংবাজির রহস্যটা বোঝা গেল। তারপর সুধাংশুবাবু অনর্গল বলে যেতে লাগলেন, কোন সাহিত্যিককে কোথায় নিয়ে গিয়ে কী কাণ্ড ঘটেছিল—একের পর এক তার কৌতুককর কাহিনী। সে-কাহিনী আপনাদের কাছে বলা যাবে না, বলা উচিতও নয়। তবে সে-কাহিনী শুনতে শুনতে কখন যে কলকাতায় পৌঁছে গেছি তা টেরও পাইনি, এমন কি বাঙ্কের উপর কাত-মেরে পড়ে থাকাটাও কষ্টকর বলে মনে হয়নি।

হাওড়া স্টেশনে নেমে বিদায় নেবার সময় সুধাংশুবাবু বন্ধুদের কাছ থেকে আমাকে একটু আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন—'আপনি কিছু ভাববেন না, আপনাকেও আমি পাইয়ে দেব।'

অবাক হয়ে বললাম—'তার মানে? কী পাইয়ে দেবেন?'

একগাল হেসে সুধাংশুবাবু বললেন—'এটা বুঝলেন না? এতক্ষণ তাহলে কি বললাম। প্রধান অতিথি বা সভাপতি এখন চট করে করা যাবে না, তবে শাখা-সভাপতি করে আপনাকে নিয়ে যেতে ঠিকই পারব। প্রথমে শাখা থেকেই শুরু হোক। কী বলেন।'

আশ্চর্য হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। উত্তরে কিছু বলবার আগেই সুধাংশুবাবু তাঁর হাসিমুখ নিয়ে প্ল্যাটফর্মের ভিড়ে মিলিয়ে গেলেন।

এই ঘটনার কয়েক বছর পরেই সুধাংশুবাবু পরলোকে চলে গিয়েছেন। তাঁর পক্ষে কথা রক্ষা করা আর সম্ভব হয়নি। অনুমান করতে পারি, যেখানে গিয়েছেন, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে নরেন মিত্র পর্যন্ত বড় বড় সাহিত্যিকদের পেয়ে আমার কথা বেমালুম ভুলে মেরে দিয়ে বসে আছেন। অন্তত শাখা-সভাপতি করে আমাকে নিয়ে যাবার একটা কিছু ব্যবস্থা কি করতে পারতেন না? অথচ আমি সেদিনও যেখানে ছিলাম, আজও সেখানেই পড়ে আছি। এটাকে মিটিংবাজ সুধাংশুকুমারের আমার প্রতি চিটিংবাজি ছাড়া আর কী বলতে পারি।